



আলোয় ফেরা

Batayan





# বাণেশ্বর

## কাগজের নৌকা

নানা স্বাদের ধারাবাহিক উপন্যাস, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ ইত্যাদি মণিমুক্তায় সাজানো





বাগায়ন

Batayan

ত্রয়োদশ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৮

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়





Issue Number 13 : October, 2018

### Editors

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA  
Jill Charles, IL, USA (English Section)

### Coordinator

Manas Ghosh, Kolkata, India

### Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

### Design & Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

### Website Support

Susanta Nandi, India

### Published By

**BATAYAN INCORPORATED**

Western Australia

Registered No. : A1022301D

E-mail: [info@batayan.org](mailto:info@batayan.org)

[www.batayan.org](http://www.batayan.org)

### Production & Management

Anusri Banerjee

### PHOTO CREDIT

Atanu Biswas, IL, USA

Front Cover

He is a scientist by profession who came to USA from Kolkata in 1980. However, more people know him as the face of Biswas Records, which he founded in 1994. In recognition of Biswas Record's contribution to Bengali music, the North American Bengali Conference (NABC) twice awarded Dr. Atanu Biswas its highest award at San Francisco Bay Area (1999) and at Detroit (2007).

He is embracing photography as his hobby and constantly aiming to develop the photography skill.

Tirthankar Banerjee  
Perth, Australia

Inside Back: Light Festival  
Back : Esperance, WA



His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

---

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

---

## দুর্গাপূজার

### ‘এত আলো জ্বালিয়েছ’

বাঙালীর বড় উৎসব দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে সবে। দীপাবলীতে যে মাটির প্রদীপ জ্বালান হয়েছিল তা নিভে গেছে। কিন্তু উৎসবের রেশ রয়ে গেছে মনে। আসলে উৎসবের উদ্‌যাপন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও সেই উদ্‌যাপনের আনন্দে স্মৃতির পাত্র ভরা থাকে। অন্ধকার দিনেও তা থেকে আলো আর উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে মনের আনাচে কানাচে। পুরনো শাল গায়ে জড়িয়ে নিলে যেমন বাড়তি উষ্ণতার আরাম পাওয়া যায় এও ঠিক সেই রকম। শালের নিজস্ব ওমের সঙ্গে যোগ হয় স্মৃতির ওম। দুয়ে মিলে তৈরী হয় এক অদ্ভুত উষ্ণতার আমেজ। এই সময়টা সেই আমেজটুকু উপভোগের সময়। আলোয় ফেরার সময়।

জানালার বাইরে তাকালেও এই একই অনুভূতি হয়। শরৎকাল শেষ। দিন ছোট হয়ে আসছে। বেলাশেষের সূর্য গাছেদের লাল, বেগুনী, গোলাপী পাতায় যখন খেলা করে দেখে মনে হয় গাছেরাও সদ্য শেষ হয়ে যাওয়া উৎসবের আনন্দে আলোয় ফিরছে আরও একবার। পাতারা আলোর পুজারী। আলোর উপাসনায় তাদের নৈবেদ্য সবসময় সাজান। ‘আলোয় ফেরা’, বাতায়নের পুজোশেষের আলোকজ্জ্বল নিবেদন। এই সংখ্যার প্রতিশ্রুতি পাঠকমনে নতুন তারার আলো ফোটান। কবিতা, ছোটগল্প, রম্যরচনা, বই ও সিনেমার আলোচনা, ক্রীড়া বিষয়ক লেখা ছাড়াও এই সংখ্যায় আছে কিছু বিশেষ আকর্ষণ। আমাদের বিশ্বজোড়া লেখক-পাঠকদের দরবারে আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ভালবেসে নিজেদের মনের বাতায়ন খুলে দেওয়ার জন্য আর সেই খোলা বাতায়নের পাশে হাজারো ব্যক্ততার মধ্যেও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ানর জন্য।

‘একটি বিন্দু জলের দুচোখে এক সমুদ্র জল  
গাছ বারিয়েছে সব পাতা, তার সম্বল বঙ্কল’

কবিতাটি বর্ষার / পৌলোমী সেনগুপ্ত

নব্বইএর দশকে এই কবির সৃষ্টি বাংলা কবিতার জগতে জায়গা করে নিয়েছিল নিজস্ব উচ্চারণশৈলীর গুণে। আমরা, বাংলা কবিতার পাঠকরা আজ দু চোখে এক সমুদ্র জল নিয়ে বসে আছি। এ বছর দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সাহিত্যিক পৌলোমী সেনগুপ্ত। তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মান্বিত। তিনি নেই। রয়ে গেছে তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ। আগামী দিনে কবিতায় তাঁকে ফিরে পাবে পাঠকরা। তাঁর শব্দ ধার করে বলি,

‘ভেবো না কবিতা শুধুই কবির, তোমার-আমার নয় !  
তোমার জন্য ছড়ান রয়েছে আকাশ . . . . পৃথিবীময়  
আমার খুরের শব্দ যখন প্রতিধ্বনির মতো  
শোনা যাবে দূরে অস্ফুটে-হবে পুরোটাই সঙ্গত ।’

তাঁর কবিতার পথ ধরে ভালবাসার আলোয় ভরে উঠবে পাঠকের হৃদয়।

সকলে ভাল থাকবেন। সুস্থ থাকবেন। এই বছরের বাকী দিনগুলো আনন্দে, শান্তিতে আর কল্যাণে ভরে থাকুক-  
আপনাদের সবার জন্য এই প্রার্থনা জানাই।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়  
শিকাগো, ইলিনয়

# সূচীপত্র

## Bangla Section

### — কবিতা —

স্বর্ভানু সান্যাল	1
শ্রেমে পড়ি	
মৌসুমী ব্যানার্জী	2
তোমার কাছে নাম চেয়েছি	
মৌসুমী ব্যানার্জী	2
জানো	
গৌতম দত্ত	3
বসন্তের অপেক্ষায়	
বার্লার্ক ব্যানার্জী	4
স্পর্শ	
দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী	5
উমা	
(কুমার সম্ভবের কতিপয় শ্লোকের বাংলায় ভাবানুবাদ)	
বৈজয়ন্ত রাহা	7
কথা দিচ্ছি	
বাবলু গিরি	8
নৈঃশব্দ হে প্রিয়া	
বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী	9
একদিন	
রজতশুভ্র মজুমদার	10
শুকতারা	

অভীক মজুমদার	10
অনুনয়	

### — গল্প —

সুজয় দত্ত	11
সে-নাম রয়ে যাবে	
স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	16
মাঝি, পাখি আর ভালোবাসা	
লালী মুখার্জী	17
ভয়	
তিতাস মাহমুদ	18
নিবারণের মা	
রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)	20
রাতের নগ্নতা	

### — রম্যরচনা —

ছন্দা বেওত্রা	21
শীতের বন্দনা	
মমতা দাস	23
গামছা বেত্তান্ত	
মানস ঘোষ	25
বাতায়নের চিঠি	

— খেলাধুলা —

সিদ্ধার্থ দে

27

কোন পুরাতন স্মৃতির টানে

মেনহাশিস ভট্টাচার্য

32

পূজা পরিক্রমা

সেতুবন্ধন, অক্টোবর '১৮

37

## English Section

Jill Charles

39

**Frederick Douglass Never  
Gave Up on Voting**

M. C. Rydel

40

**The Haunted Villanelle**

Mousumi Banerjee

41

**Still**

Binita Gupta

42

**Sincerely**

Susim Munshi

43

**Yes I Am**

Jerry Kaiser

44

**Butterfly**

Daniel Staub Weinberg

45

**I Heart Mir I Love  
Peace in Russian**

Becky Laurent

46

**HOW DO I FIT IN?**

Lew Rosenbaum

48

**Who Shall Inherit The Earth? –  
Lew Rosenbaum**

Sreya Sarkar

54

**Lady in Red**

Ranajoy Ganguly

60

**Film Reviews**

## অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ – বাতায়নের পাথেয়

‘দিদি, একটু আগে ফিরলাম কবি শঙ্খ ঘোষ -এর বাড়ি থেকে। বাতায়ন সম্পর্কে জিগোস করলাম, বাতায়ন দেখার সময় পেয়েছেন? উনি বললেন, নিশ্চয়ই। কেমন লাগল, সব মিলিয়ে? ভালোই। পরবাসে এমন একাকী উদ্যোগ খুব কঠিন এবং প্রশংসার।’

— ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক ও পত্রভারতীর কর্ণধার শ্রী ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ

## স্বর্ভানু সান্যাল

## থ্রেমে পড়ি

আমি মাঝে মাঝে থ্রেমে পড়ি  
এই বসন্তে পড়লাম একটা হলুদ ঘাস ফুলের থ্রেমে  
যে বাসস্টপ থেকে বাস ধরে রোজ কাজে যাই  
যেখানে পরে নিই আমার কর্পোরেট মুখোশ ঠিক সেইখানটায়  
সময়ের একটু আগেই ফুটে উঠেছে তার ফুলেল যৌবন  
আর মুগ্ধ চোখ নিয়ে আমায় প্রথম দেখেছিল সে

আমি যেই ফিরে তাকালাম, চোখ দিয়ে তারিফ করলাম  
আশ্রয় পেল ওর নবীন যৌবন  
তারপর থেকে রোজ সকালে বাসস্টপে এলে  
মাথা দুলিয়ে ও অভিবাদন জানায়  
আমার চোখে লেগে থাকে ওর নিটোল যৌবনের প্রতি মুগ্ধতা  
চোখে চোখে কথা হয় . . . অন্তরে অন্তরে ।  
প্রতীক্ষার ক্ষণিক অবসরে নীরবে গাঁথা হয় নস্কীকাঁথা

তারপর অন্য ঘাসফুলেরা এসেছে সারিতে সারিতে  
আমি কিন্তু দৃষ্টি বিনিময় করিনি  
আমি একনিষ্ঠ প্রেমিক ভীড়ের মধ্যে খুঁজে ফিরি  
সেই মুখ যে সময়ের আগে সাজিয়েছিল পসরা

আজ দেখলাম ওর চুলে ধরেছে পাক  
চোখের তলায় কালি  
কিছু পাপড়িও খসে গেছে বোধ হয় . . .  
উত্তীর্ণযৌবনা

অন্য নবীন ঘাসফুলেদের সকৌতুক দৃষ্টি  
আজ এড়াতে পারলাম কই ?



**স্বর্ভানু সান্যাল** — জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায় । ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে । কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার । চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত । পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে । অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন । “যযাতির বুলি” (<https://jojatirjhuli.net>) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন । ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (<https://www.facebook.com/jojatirjhuli>) । প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক । স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে । অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা । আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া ।



## মৌসুমী ব্যানার্জী

### তোমার কাছে নাম চেয়েছি

তোমার কাছে নাম চেয়েছি  
দীর্ঘ বলে ডাকবে আমায় ?  
বুকে খোলা ছাদ চেয়েছি,

ছাদ যেখানে আকাশ নামায় !  
একেকটা দিন বড্ড বিবশ  
বড্ড অসুখ চোখের পাতায়  
ভালোবাসা স্তৈর্য আনো

মাদুর পাতো মনের কোণায় ।  
নদীর ধারে, সেদিন রাতে  
ঝড় চেয়েছি

যে ঝড় শুধুই বৃষ্টি নামায় ।  
শরীর পেতে  
তোমার কাছে সুর চেয়েছি . . . .  
রেখাব থেকে নিষাদ মীড়ে  
বাজাও, শুধু বাজাও আমায় ।

## মৌসুমী ব্যানার্জী

### জানো

----- জানো, আজ আমি আকাশে মাদুর পেতে বসেছি  
আলো দেখবো বলে ।

----- আকাশ ভরা তারার আলো ?

----- দূর, তুমি যেমন বোকা !  
আলোয় বসে আলো দেখা যায় ?

----- তবে ?

----- জোনাকি ।

দেখো, বনে বনান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে ।

----- সে তো আলোর মৃত্যু অন্ধকারে ।  
তোমার ভালো লাগে ?

----- আচ্ছা বোকা কিন্তু তুমি !

দেখছো না, ‘কেন’, ‘কিন্তু’, ‘যদি’ গুলো  
মিলিয়ে যাচ্ছে জোনাকির পিঠে ভর করে !  
একে তুমি মৃত্যু বলো ?!



আমেরিকা ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সের অধ্যাপক ডঃ মৌসুমী ব্যানার্জী, গবেষণার বিষয়বস্তু অঙ্ক দিয়ে অনকোলজি-র সমাধান । জন্ম কলকাতায়, লেখাপড়া কলকাতার পাঠভবন স্কুলে । স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং পরবর্তীকালে ডক্টরেট উপাধি আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে । কর্মসূত্রে বিশ্বনাগরিক । পেশাগতভাবে মৌসুমীর বাস ঘোর বিজ্ঞানের জগতে । বিজ্ঞান ঠুঁকে দেয় ইন্সট্রুমেন্টাল স্টিমুলেশন, কিন্তু সাহিত্য সংগীত মৌসুমীর কাছে ঘরে ফেরা, জ্বরের মাথায় মায়ের হাতের জলপটি, পরম নির্ভরতা । লেখালেখির শুরু কলেজ জীবন থেকেই । মৌসুমীর কবিতায় নাগরিক একাকীত্ব এবং জীবনের সঙ্গে জীবন সম্পৃক্ত করে বাঁচা, পাশাপাশি রয়েছে অপলক মুগ্ধতায় । বাড়ি বদলে গেছে, দেশ বদলে গেছে, তবু মৌসুমীর কবিতায় আজও সেই সুরকিখসা দেয়ালের গায়ে টিকটিকি আটকে থাকা মুহূর্তের অপাপবিদ্ধ ছবি ।

## গৌতম দত্ত

## বসন্তের অপেক্ষায়

আমিতো সময়ের রকে বসে পা দোলাচ্ছি  
 পায়ের তলায়, মাথার ওপরে আদিগন্ত সিঁড়ি  
 বুঝতে পারছি না উঠব না নামব  
 স্বর্গ বা নরক কোন দিকে? দেবুর মত চিন্তা করলে ওপরে উঠলেই সব যন্ত্রণামুক্তি  
 কিন্তু তাই কী সত্যি?  
 ওপরে উঠতে উঠতে হালকা বাতাসে দম বন্ধ  
 বিষাক্ত সাপ, রেডিয়েশন, অখুশির জঙ্গল  
 কোথায় সেই প্রতিশ্রুতির স্বর্গ? তবে কী  
 নিচে নামলেই ভাল ছিল? কে জানে! জানা পড়ার তর্কের কোন শেষ নেই  
 একবার একটা গরু এভাবেই গাছে উঠেছিল!  
 আর আমি এখনও সময়ের রকে বসে আছি তোমার অপেক্ষায়  
 এই আজকের ভোর প্রজাপতি রোদ  
 জুঁইগন্ধমাখা বাতাস এসব যেন তোমারই জন্য  
 দেখছ না গুটিপোকা খোলস কেটে রঙীন ডানা মেলেছে  
 প্রকৃতির এত ব্যস্ততা, এসব নিশ্চয় তোমারই জন্য, কারণ  
 শুধু তুমি মুখফুটে একবার বলেছিলে আসব –

## Waiting for a Spring

I am bouncing my legs sitting on a time porch  
 endless stairways underneath my legs & above my head  
 don't know if I want to go up or down  
 towards hell or heaven, which is the right way ?  
 If I could think like my friend Debu — once I go up the stairs happiness is absolute !  
 is it really true?  
 once I start climbing stairs light air suffocates;  
 radiation, poisonous snakes, jungle of unhappiness all are waiting!  
 where is that promised heaven? may be  
 I should have walked down, who knows!  
 knowledge, learning and debate have no ends;  
 myth says that's how a cow climbed a tree once !  
 and I am still waiting for you sitting on this time porch  
 this morning, butterfly sunlight,  
 breeze full of jasmine smell, these are all for you.  
 look caterpillars broke their cocoons & flapping their colorful wings along with busy nature.  
 again these are all for you, because  
 you once promised to return



গৌতম দত্ত প্রায় চল্লিশ বছর আমেরিকাবাসী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নাট্যকার ও কবি। ১৯৯০ দশকে লিখেছেন প্রমা পত্রিকায়। তারপর ধারাবাহিক ভাবে লিখেছেন নবপর্যায় কৃতিবাসে। লিখেছেন দেশ, সানন্দা সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। কাব্যগ্রন্থ – গৃহ যুদ্ধের দলিল (আনন্দ), বরফে হলুদ ফুল (প্রতিভাস), যোদ্ধা ঘুমিয়ে আছে (প্রমা), মুখোমুখি (প্যাপিরাস)। একশো বছরের আফ্রিকান আমেরিকান কবিদের কবিতা সংকলন “আমি আমার মৃত্যুর পর স্বাধীনতা চাই না” (আনন্দ) সুনীল গঙ্গাধার্যায়ের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনা। উড়ালপুল ওয়েবজিনের সম্পাদক।



## বালাৰ্ক ব্যানার্জী

## স্পৰ্শ

আজ বহু দিন পর  
 তোকে স্পৰ্শ করলাম  
 In the dark folds of your dress  
 My fingers searched for stars  
 Tracing constellations across your back  
 They held universes in your hair  
 All your secrets, all your unspokens  
 I stole from your lips with mine  
 And drank in your eyes again  
 My fingertips  
 They read your skin like Braille  
 Moving surely flicking pages  
 Of a lost familiar book of poems  
 Seeking out old favourite couplets  
 Seeking wisdom  
 Finding magic  
 Drawing words  
 Making promises  
 আজ বহু দিন পর  
 তোকে স্পৰ্শ করলাম  
 আজ বহু দিন পর  
 আবার কলম তুললাম



**Balarka Banerjee** is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company in Sydney. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

## দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

### উমা (কুমার সম্ভবের কতিপয় শ্লোকের বাংলায় ভাবানুবাদ)

দিনে দিনে বাড়ে শশীকলা যেন  
পূর্ণ চাঁদের রূপে হয় ধনী  
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে সেই মেয়ে  
জ্যোৎস্না ছড়ায় অঙ্গলাবণী  
(দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীৱ লেখা ।  
পুপোষ লাৱণ্যমযান্বিশোষাজ্যোত্স্নান্তরাণীৱ কলান্তরাণিতা)

সে তো পর্বত রাজার কন্যে  
তাকে পার্বতী ডাকে পরিজনে  
মা নিষেধ করে, “এটা কোরোনা মা”  
রূপসীর নাম সেই থেকে “উমা”  
(পার্বতীত্যাভিজনেন নাম্না বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাৱ ।  
উ মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ।।)

পিতা হিমবান, ঘরে ছিল তার  
বহু সন্তান, তবুও কেমন  
কন্যাটি ছিল আদরের ধন  
ফুলের থেকেও আমার মুকুল  
ভ্রমরের কাছে স্নেহের যেমন  
(মহীভূতঃ পুত্রৱতৌ ঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তির্ম ।  
অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিৱেফমালা সৱিশেষসঙ্গা)

প্রদীপের বুকে শিখাটি যেমতি  
স্বর্গের পথে যেন ভাগীরথী  
মার্জিত বাক বিদ্বজ্জন  
চেনায় যেমন পিতার নিকটে উমাও তেমন  
(প্রভামহত্যা শিখর্যেৱ দীপস্ত্রিমার্গ্যেৱ ত্রিদিৱস্য মার্গঃ ।  
সংস্কারৱত্যেৱ গিরা মনীষী তয়া স পূতহ্চ ৱিভূষিতহ্চ ।।)



মন্দাকিনীর তীরে বসে বসে  
কন্দুক ক্রীড়া, মনের হরষে  
বালির ওপরে সখীদের নিয়ে  
পুতুলগুলোকে রাখতো সাজিয়ে  
(মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাশি: সা কন্দুকৈ: কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ ।  
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং ক্রীডারসং নির্বিহাতিব বাল্যে ।।)

মান সরোবর থেকে অনায়াস  
শরতে যেমন উড়ে আসে হাঁস  
রাতে ফোটা ফুল রাত পোহালেই  
আপনা থেকেই ছড়ায় সুবাস  
সেরকম যেন উমা পেয়েছিলো  
আর জন্মের বিদ্যাভ্যাস  
(তাং হংসমালা: শারদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাভ্যাস: ।  
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যা: ।।)



ডঃ দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। জন্ম — মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে। কলকাতার লেডি ব্রোউন কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈদিক সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। ব্যাঙ্গালোরের জৈন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছেন। সম্পাদনা করেন বাংলা কিশোর ওয়েব ম্যাগ ম্যাজিক ল্যাম্প। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির শুরু। লিখতে ভালোবাসেন কবিতা ও ছোটগল্প। ছোটদের জন্য প্রথম গল্প সংকলন “সাত আকাশের ওপারে” (নান্দীমুখ প্রকাশন ২০০৫) প্রকাশিত হয় কলেজ পড়ার সময়। কবিতার সংকলন — কবিতার পঞ্চপ্রদীপ (দ্বীপ প্রকাশন ২০১৫), মেঘ বৃষ্টি কথা (ধানসিঁড়ি প্রকাশন ২০১৮), ত্রি, একটি ত্রিলার সংকলন (ফ্যাভ বুকজ পাবলিকেশন ২০১৮)। এছাড়াও কিশোর ভারতী, শুকতারা, আনন্দমেলা, প্রভৃতি পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন ওয়েবম্যাগে গল্প, কবিতা লিখে থাকেন। এই প্রথম প্রাপ্তমনস্ক ত্রিলার লিখছেন। লেখালেখির বাইরে কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ করতে, ছবি আঁকতে, ও বই পড়তে ভালোবাসেন।

## বৈজয়ন্ত রাহা

## কথা দিচ্ছি

আমি আমার অভিমানের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছি তার আদরের জন্য,  
তার ভালবাসার জন্য,  
তার যত্নের জন্য  
বুকের ভিতর খাঁ খাঁ করে  
কিন্তু ক্রমাগতঃ একটি থেকে অপর অভিমানে আমি পথ হারিয়ে ফেলছি।

ও ধুলোর মধ্যে গড়িয়ে যাওয়া বিকেল  
ও গাছের পাতায় জমে থাকা জল  
আমায় চিনতে পেরেছো?  
তবে দাও, আমাকে হাত ধরে ঘরে পৌঁছে দাও,  
আমার ঘরে যেখানে শুধু তার ছায়া আমাকে গ্রাস করে,

আমি এক অভিমানকে অনুসরণ করতে করতে পথ হারিয়েছি,  
আর অন্ধকারে আরও অজস্র অভিমান পায়ের পাতা চেপে ধরেছে,  
গলা টিপে ধরেছে,  
আমিতো শ্বাসও নিতে পারছি না,

আমি কি করে তার কাছে আমি হয়ে যাই?

ও ফুলবাগান, ও শান্ত নির্জন, ও বৃষ্টি গুরু হাওয়া  
আমিতো তলিয়ে যাচ্ছি,  
তোদের পায়ে পড়ি, একবার তার কাছে নিয়ে চল,

কথা দিচ্ছি তাহলে আবার প্রথম থেকে  
একদম নতুন ভাষায় লিখতে শুরু করব তাকে,

কথা দিচ্ছি।



**বৈজয়ন্ত রাহা** — এই মুহূর্তে বাংলার কবি মহলে একটি আলোচিত নাম। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে জন্ম। সুবর্ণরেখার তীরে।  
লিখছেন ছেলেবেলা থেকে, ছোট বড় অজস্র পত্রিকায় তাঁর গল্প কবিতা নাটক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে গত পঁয়ত্রিশ বছর।

উচ্চপদস্থ চাকুরীর চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর কলম গতিশীল। তাঁর কবিতা যদিও প্রকৃতি ও অনুভূতিতে বিষাদময় ও  
একাকীত্বে উপভোগ্য। আশা করি সকলের ভালো লাগবে।

তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল; সময়ের অঝোরে, চেনা চাঁদ অচেনা আলো, না-বলা কথার বাঁকে, পাঁচ দিগন্ত, নদীর ডানায় ইচ্ছেকুসুম,  
অক্ষর উড়ান ইত্যাদি।



## বাবলু গিরি নৈশব্দ হে প্রিয়া

আহা শুধু একটা মধু রাতে এসো !  
 এসো প্রিয়া, শুধু একটা স্বপ্নের রাতে !  
 এসো প্রিয়া আমি সব বিলায়ে দেবো !  
 হে প্রিয়া সব কিছু কেড়ে নিও ।  
 আমি শুধু দেখে যাবো –  
 তোমার নিষ্ঠুর নৈশব্দ যাত্রা ।  
 জানি আমার যা কিছু ছুঁড়ে ফেলে দেবে,  
 আমার এ অক্ষর অগ্নি যাত্রায় ।  
 হে প্রিয়া জানি, আমার সব রমণী পড়ে রবে !  
 শুধু তুমি আমায় নিয়ে চলে যাবে, সুদূরে –  
 আবার কোথাও জন্ম দিতে !  
 চন্দনে চিতায় সাজাক ওরা ।  
 তুমি প্রিয়া হাত ধরো,  
 উলঙ্গ নিয়ে চলো মধুরাতে,  
 হে প্রিয়া অগ্নি মাখাও যতনে ।



শ্রী বাবলু গিরির জন্ম কলকাতায়, কিন্তু প্রথম জীবন বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামে কেটেছে । পরে কলকাতায় পড়াশুনা ও সাথে সাহিত্যচর্চা । সত্তরের দশকের গোড়া থেকেই লেখা লেখি শুরু, সেই সময় নজরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত “ছায়ানট” পত্রিকার সম্পাদনা, এ ছাড়া “সিনে ক্ল্যাপস্টিক” ও “কলাকুশলী” নামে দুটি সাহিত্য ও বিনোদন পত্রিকার সহ সম্পাদনা করেন । ২০১৬ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ “পর্যায়ণ” প্রকাশ পায় এবং ২০১৮ সালে প্রকাশ পায় “ব্রহ্মাণ্ড শব্দসরসী” দেজ পাবলিকেশন এর কমলিনী থেকে । এ ছাড়া তাঁর সম্পাদনায় দুটি সংকলন “সাহিত্যের পৃথিবী” ও “শব্দের পৃথিবী” প্রকাশিত । এবছর বেরোতে চলেছে দুটি কাব্যগ্রন্থ – “ঈশ্বর ও ফেরিওয়ালা” আর একটি “ভাত কাপড় ও ছাদ” পুরস্কার পেয়েছেন – “জয়দেব-পদ্মাবতী” পুরস্কার ও “পরম্পরা” পুরস্কার ।

## বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী একদিন

একদিন ছায়া যত মিলে যাক অন্তরালে,  
কবিগান ভাটিয়াল সব পড়ে থাক।  
গাঙচিল রাত জাঙক ইছামতী বুকো,  
বাকী থাকা সময়েরা সময় না পাক।

একদিন যত আলো একসাথে বসে,  
সুখে-দুখে মিলেমিশে এক হয়ে যাক।  
ছিঁড়ে যাওয়া তারেরা কি ঝংকার তোলে?  
তবুও তো কিছু মন আজ প্রেম খুঁজে পাক।

একদিন মরুবালু হোক উড়েখই,  
কিছু কথা অকারণ কথা থেকে যাক।  
পূর্ণিমার চাঁদ না হয় বালসেছে রুটি,  
জ্যোৎস্নার কি বা দোষ, তাকে বুকো রাখ।



কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক তথা ভারত সরকারের নীতি আয়োগ অনুমোদিত একটি গবেষণা সংস্থার ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে আসীন বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী মহাশয় বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও নিরলস সাধনায় ব্রতী একজন মানুষ। ভূগোল ও পরিবেশ সংক্রান্ত ১২ টি বই প্রকাশের সাথে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তার কবিতাগুলিও পাঠকমহলে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এবারে বাতায়ন-পাঠকের সঙ্গে তারই আলাপ-পর্ব।



## রজতশুভ্র মজুমদার

### শুকতারা

এখনও এখানে ভোরের মায়াবী তারা  
গতজন্মের স্মৃতির নিমন্ত্রণে  
আগুনোন্মুখ প্রজাপতিটির মতো  
অত্যাশ্রয়ে ছুটে আসে অকারণে

#

তারা দেখে যায় এখনও এখানে গাছে  
পাত্রোদগম প্রকৃতির নিয়মেই  
হয়, ঠিক তার পাশে উড়ে যায় ধোঁয়া  
যেখানে প্রেমের অনুরাগমাখা সেই

#

মৃতদেহ থেকে স্মৃতিলেখা খসে পড়ে,  
যেখানে তাদের সারাৎসারের ছাই  
চিতা থেকে উঠে নিদ্রাভিভূত ভোরে  
বলে, আমি শুধু তোমাকেই পেতে চাই

#

অযুত বছর সে তারা জ্বলছে ভোরে  
ভালোবাসাটির অতিমানবিক জোরে . . . .



রজতশুভ্র ‘দেশ’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ থেকে শুরু করে বহু বিখ্যাত বাচিক শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর কবিতা নিয়মিত শোনা যায় আকাশবাণী, দূরদর্শন কিংবা বিভিন্ন মুক্ত মঞ্চে। তাঁরই কবিতায় সমৃদ্ধ আশ্রয়-অডিও থেকে প্রকাশিত দুই প্রখ্যাত থিয়েটার ব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও দেবশঙ্কর হালদারের যুগল এলবাম ‘কবিতা ১ ও ২’ বিশেষ জনপ্রিয়।

রজতের ‘১০০ প্রেমের কবিতা’র প্রায় সব কবিতাই কোনো না কোনো অডিও ভিডিও এলবামে অন্তর্ভুক্ত। মূলত ‘দেশ’ ও ‘কৃত্তিবাস’-এ প্রকাশিত এই কবিতাগুলি প্রেমের গহন অনুভব কথা !

## অভীক মজুমদার

### অনুনয়

বাক্যেই জোছোনা পড়ে, হয় গুরু, বাক্যেই জোছোনা  
বুকে যে ফাগুন বাড়ে  
সে তবুও কেন অন্যমনা ?

অনেক আঁন্ধার হলো,  
অভিমাণে রাঙা  
সিঁথি অভিমাণে রাঙা

বাক্যেই জোছোনা তার  
হয় গুরু, হাবুডুবু ভাঙা  
তরী কোথা  
কোথা পাবো ডাঙা

বাক্যেই জোছোনা পড়ে  
হয় গুরু, বাক্যেই জোছোনা

সে যেন আকাশ, যেন নক্ষত্র কপালে জ্বলে  
সে যেন উন্মাদ  
আর  
অতলান্ত, মহাশূন্য

হয় গুরু, তলই কি পাবো না ?

শোণিতে নিশ্চিতি বাড়ে  
হৃদয়ে কি ফুলকি জ্বালাবো না ?

বাক্যেই জোছোনা তার  
হয় গুরু, ভিক্ষা কি যাবো না ?

অভীক মজুমদার কলকাতা বাসী। কবিতা তাঁর নেশা এবং শখ। বাংলা কবিতার একনিষ্ঠ চর্চাকারী। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি কবিতার বইও আছে।

## সুজয় দত্ত

## সে-নাম রয়ে যাবে

হ্যাঁ, কাগজে বা পাথরে নাম লেখা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সে তো এক কিংবদন্তী গায়ক কবেই বলে গেছেন। তবে তাঁর গানের তৃতীয় লাইনে নামের অমরত্বের যে পস্থা বাতলানো আছে, আজকের যুগে তা পুরনো দশ পয়সার কয়েনের মতোই অচল। পশ্চিমী দুনিয়ার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক (সেখানে হৃদয় দেওয়ানেওয়া নামক ট্রায়াল-এররের খেলাটা অনেকদিন থেকেই স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ), ফিল্মী তারকাদের গ্ল্যামার-জগতের কথাও বাদ দিলাম (সেখানে ঘনঘন প্রণয়সঙ্গী বা সঙ্গিনী বদলানোটা ডিশ্‌ওয়াশার বা শেভিং ক্রীমের ব্র্যান্ড বদলানোর মতো শুধু প্রত্যাশিতই নয়, মিডিয়া আর পাপারাৎজির কাছে পরম-আকাঙ্ক্ষিত), আমাদের এই পোড়া বঙ্গদেশের আধুনিক তরুণসমাজের কাছেও প্রেম-ভালবাসা ব্যাপারটা প্রায় সার্কাসের ট্র্যাপিজ খেলার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ একে ছাড়ছে তো কাল ওকে ধরছে। শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় সদর্পে ঘোষণা করছে নিজের ধরা-ছাড়ার স্ট্যাটাস। ওটাই এ যুগের স্ট্যাটাস সিঙ্কল। অতএব আজকাল হৃদয়ে নাম লিখে বেশীদিন টিকিয়ে রাখার আশা অবাস্তব।

তাহলে এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কী করে মানুষের নাম? না, বিখ্যাত আর কুখ্যাতদের কথা বলছি না, তাদের ব্যাপারই আলাদা।

বলছি আমার-আপনার কথা। ‘চালাক-চতুর’ মুঠিফোন যদি কজায় থাকে, তাহলে একটা সোজা উপায় হল বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলা। তখন আর লোকে চাইলেও ভুলতে পারবে না। প্রতিদিন তাদের ফোন কুড়ুং কুড়ুং করে মনে করিয়ে দেবে অমুকে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্টের লুচি-আলুচুড়ির ছবি পোস্ট করেছে, অমুকে একটা সিনেমা দেখে এসে এক্সুনি দুটো মন্তব্য করেছে আর তাতে সাঁইতিরিশ জন হেসেছে (মানে হাসিমুখের ইমোজি পাঠিয়েছে আরকি), অমুকে লিখেছে সামনে পরীক্ষা বলে এখন টেনশনে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে আপনার কর্তব্যবোধেও সুড়সুড়ি দেবে – অমুকের আজ পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকী বা তমুকের কাল জন্মদিন, শুভেচ্ছা জানালে না? বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের বিবর্তন নাকি এখনও জারি আছে। সুতরাং আশা করা যায় অচিরেই সোশ্যাল মিডিয়া মনে করিয়ে না দিলে লোকে নিজের জন্মদিনটাও ভুলে যাবে, অথবা শিশুরা মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাসের বদলে স্মার্টফোন নিয়ে জন্মাবে।

তার মানে কি এ-জগতে স্মার্টফোন-হীন সাধারণ মানুষের একমাত্র ভবিতব্য বিস্মৃতির অতল গহ্বর? ভয় নেই, ব্যাপারটা অতটা হতাশাজনক নয়। আপনি-আমি যখন হাফপ্যান্ট পরে ডান্ডাগুলি (বা ফ্রক পরে খেলনাবাটি) খেলে বেড়াতাম, কিংবা প্রাইমারী ইস্কুলের করিডোরে পড়া না পেরে নীলডাউন হয়ে থাকতাম, তখন স্মার্টফোন কোথায়? স্টীভ জব্‌স্‌ তখনো ভর্তিই হয়নি কলেজে, ড্রপ্‌আউট হওয়া বা ‘আপেল’ ফলানো তো দূরের কথা। কিন্তু সেই সময়কার খেলার সাথীদের বা স্কুলের সহপাঠীদের কারো কারো নাম এখনো কেন মনে আছে বলুন তো? না না, যে বিচ্ছু ছেলেটার ডান্ডার ঘায়ে আপনার হাঁটু ফুলেছিল বা যে বিশ্বাসঘাতক ক্লাস-মনিটর আপনার নামে টীচারের কাছে নালিশ করেছিল গন্ডগোল করেছেন বলে, শুধু তাদের নাম নয় – আরো কিছু নিরীহ নামও দেখবেন স্মৃতিতে রয়ে গেছে। তার কারণ সম্ভবতঃ যার নাম সেই মানুষটা নয় – নামটার নিজস্ব বিশেষত্ব।

যেমন ধরা যাক কারো নাম যদি অর্ধেন্দু পুরকায়স্থ হয়? ধরতে হবেনা, অনেক ছোটবেলায় আমার সতিই ঐ নামের এক সহপাঠী ছিল। তাকে আমরা ডাকতাম ‘হাফ্‌ ফুল্‌’ বলে (অর্থাৎ ‘অর্ধ’ আর ‘পুরো’র ইংরেজী)। এতে সে নিজে যত না রাগত, তার চেয়ে বেশী ক্ষেপে যেত তার দাদা কৃষ্ণেন্দু – আমাদের দু-ক্লাস ওপরের। নিশ্চয়ই ‘ফুল্‌’-এর অন্য বানান করত মনে মনে। এই নামটা স্মরণীয় হয়ে থাকার আরো কারণ হল, ছেলেটার কাছে শুনেছিলাম ওদের একানবতী পরিবারে

বিভিন্ন প্রজন্মের সব ছেলেদের নামই ‘ইন্দু’ দিয়ে। ওর বাবারা তিন ভাই, তাঁদের নাম পূর্ণেন্দু, সিতেন্দু আর শরদিন্দু। জ্যাঠাতুতো দাদা অমলেন্দু আর খুড়তুতো ভাই দীপেন্দু, ইত্যাদি। এ-জিনিস আমি আমার ছাত্রজীবনে আর একবারই দেখেছি। কলেজে পূজা পরাজপে বলে এক মারাঠী ছাত্রী ছিল আমার তিন বছরের সিনিয়র। ও বলত ওর মা-মাসী আর মামাতো-মাসতুতো সব দাদা-দিদিদের নাম নাকি পুজোকেন্দ্রিক। দুই দিদি অর্চনা ও অঞ্জলি, মামাতো আর মাসতুতো দাদারা যথাক্রমে প্রসাদ ও নৈবেদ্য, মা আরাধনা এবং মাসী উপাসনা। বলুন তো, এরকম ব্যাপার কখনো ভোলা যায়?

ঠিক যেমন ভোলা যায়না বাঙালীদের নাম বিদেশী নামের অনুকরণে রাখলে। এটা সাধারণতঃ দুভাবে হয়ে থাকে। হুবহু কোনো বিখ্যাত বিদেশী নাম তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া, অথবা বিদেশী নামটার সঙ্গে দারুণ সাদৃশ্য আছে এমন কোনো বাংলা নাম ব্যবহার করা। খ্যাতনামা ইংরেজ ফুটবলার ও ক্রিকেটার ডেনিস কম্পটনের নামেই যে কলকাতার একটি ঐতিহ্যশালী ফুটবল ক্লাবের এককালের অপরিহার্য রাইট ব্যাকের নামকরণ হয়েছিল কম্পটন দত্ত, তা না জানলেও আন্দাজ করা যায়। অধুনা ভারতীয় ক্রিকেট দলের একজন উঠতি প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড়ের নাম (ওয়াশিংটন সুন্দর) আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতির থেকে ধার করা। যে বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিকের নামানুসারে সমরেশ বসু তাঁর এককালের জনপ্রিয় কিশোর চরিত্রটির নামকরণ করেছিলেন, আধুনিক প্রজন্মের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক ঝুম্পা লাহিড়ির এক সাড়াজাগানো উপন্যাসের নায়কও ছেলের নাম রেখেছেন সেই নিকোলাই গোগোলের নামে। এছাড়া ম্যাক্সিম গোর্কি আর নিকোলাই অস্ট্রভ্‌স্কির দুই কালজয়ী বৈপ্লবিক উপন্যাসের নায়কের নামও (পাভেল) শুধু বাংলা সাহিত্যেই ব্যবহৃত হয়নি, বাঙালী ছেলেদের ডাকনামও হয়েছে। বিদেশী নামের সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্যের তালিকায় প্রথমেই মনে আসা উচিত ছোটবেলার রূপকথার সেই রূপাঞ্জলির কথা, এক উঁচু মিনারের ওপর নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে যে ছিল বন্দী আর তার সঙ্গে রাজপুত্রের গোপন সাক্ষাতের একমাত্র উপায় তার লম্বা চুল বেয়ে ওপরে ওঠা। রূপাঞ্জলি যে জার্মানীর গ্রিম্‌ভাইদের রূপকথামালার অন্যতম চরিত্র রাপানজেল, তা আর বলে দিতে হবেনা। পরশুরামের গল্পেও আমরা দেখি, এলিজাবেথ বা বেট্‌সি হয়ে যায় বেতসী চাকলাদার আর শার্লক হোম্‌সের বাঙালী সংস্করণ দাঁড়ায় সরলাক্ষ হোম। সাম্প্রতিককালে বাংলার ছায়াছবি আর গানের জগতে লকেট আর রকেট নামদুটো হয়তো শুনে থাকবেন অনেকে।

কিন্তু এ তো গেল বিখ্যাত আর আধা-বিখ্যাতদের কথা। আগেই বলেছি না, এ-লেখা শুধু তাদের নিয়ে নয়? আমার এক দিল্লীনিবাসী প্রাক্তন সহপাঠীর বাবা বিজ্ঞানভিত্তিক কম্পকাহিনীর জনপ্রিয় লেখক আইজ্যাক অ্যাসিমভের এতই ভক্ত ছিলেন যে ছোটছেলের নাম রেখেছিলেন অসীমভ। তার দাদার (অর্থাৎ আমার বন্ধুর) নাম অমিতাভ হওয়ায় বেশ ছন্দমিলও ছিল। হাইস্কুলে আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের সিনিয়র একটি ছেলে হায়ার সেকেন্ডারীতে দারুণ রেজাল্ট করে খড়গপুর আই আই টিতে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে ঢুকেছিল। কাকতালীয়ভাবে ঠিক সেই সময়েই আমেরিকায় প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সহজে বহনযোগ্য (পোর্টেবল) কম্পিউটার বাজারে ছাড়ে অসবোর্ন কম্পিউটার কর্পোরেশন, যা আশির দশকের গোড়ার দিকে খুব জনপ্রিয় হয়। পরে সেই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম অসবোর্ন যখন শেষজীবনে ভারতের তামিলনাড়ুতে থাকতেন, আমার স্কুলের সেই ছেলেটি চাকরিসূত্রে গুঁর সান্নিধ্যে আসারও সুযোগ পায়। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও যে নিজের একমাত্র ছেলের নাম রেখেছিল অসবর্ণ — সেটা আদৌ কাকতালীয় নয়। পরবর্তীকালে আমার এক কলেজের বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম তার জনৈক দূরসম্পর্কের আত্মীয় দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার পর এক আইরিশ মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাঁর শাশুড়ির নামে (বার্নাডেট) প্রথম সন্তানের নাম রাখেন বর্ণাদিত্য। যাইহোক, এই প্রসঙ্গ শেষ করি আমার একেবারে ছোটবেলার একটা স্মৃতি দিয়ে। আমি যখন ক্লাস ওয়ানে, সেই সময় আমার মাসীর বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে যে পরিবারটি ভাড়া থাকত তাদের দুই মেয়ের নাম ছিল বিউটি আর কিউটি। আজও মনে পড়ে বাড়ীর বড়রা রসিকতা করে বলতেন ওদের আরও একটা মেয়ে হলে তার নাম কি হবে ডিউটি?

অনেকসময় বিদেশী নামের অনুকরণ করার ইচ্ছে না থাকলেও সেটা এড়ানো যায়না। বাংলায় অনীতা রায় বা রীতা দে — এই নামগুলো বহুলপ্রচলিত। পশ্চিমী দুনিয়ায় এসে মালুম হল ইংরেজীতে Anita Ray আর Rita Day-ও বিরল নয়। মুশকিল হচ্ছে, যেহেতু রায় আর দে-কে ইংরেজীতে অনেকরকম বানানে লেখা যায়, বিলেত-আমেরিকায় Anita Ray বা



Rita Day দেখলে চট করে বোঝা কঠিন ওটা সেখানকারই কোনো নাগরিকের নাম না বাংলা থেকে আসা কোনো অভিবাসীর (বা তার দ্বিতীয় প্রজন্মের)। আমার নিজের একবার এদেশে ঐরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় প্রথম যখন ইউনিভার্সিটির ডর্মিটরী ছেড়ে বাইরে অ্যাপার্টমেন্ট নেব ঠিক করলাম, একদিন এক অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখি লিজিং অফিসের দরজায় ম্যানেজারের নাম লেখা আছে Chandra Paul। আমি তো খুব খুশী। নিশ্চয়ই বাঙালী ম্যানেজার, স্বজাতীয় বুঝলে ভাড়া না কমান্ব অন্ততঃ একটু বাড়তি সাহায্য-টাহায্য করবে। ওমা, দরজা ঠেলে অফিসে ঢুকে দেখি ভারী চেহারার এক মধ্যবয়সী আফ্রিকান-আমেরিকান ভদ্রমহিলা বসে আছেন, একমাথা চুলে জটা পাকানো। সেদিন অবশ্য মিস্ শ্যান্ড্রা পল সাহায্য যথেষ্টই করেছিলেন — একজন নবাগত বিদেশী ছাত্রের গোবেচারা মুখ দেখে করুণা হয়েছিল বোধহয়।

পল বলতে মনে পড়ল অন্য দুটো ঘটনার কথা। বিয়ের পর মেয়েদের পদবী পরিবর্তনের ফল কখনো কখনো কিরকম মজার হতে পারে, তারই উদাহরণ। আমার এক আত্মীয়ের বড়মেয়ের নাম অপালা। এমনিতে সুন্দর নাম, কিন্তু ঘটনাচক্রে কলেজে পড়ার সময় ও যার প্রেমে পড়ল, তার পদবী পাল। নাম মিলিয়ে তো আর লোকে প্রেমে পড়ে না — অতএব কিছু করার নেই। বিয়ের পর ওর সমবয়সীরা ওকে ঠাট্টা করে ‘জোড়া আপেল’ বলে ডাকত। কলেজে আমার কয়েক বছরের জুনিয়র ছিল সাহানা বলে একটি মেয়ে। তারও ঐ দশা। লালিত্য আর মেধার গুণে তার প্রণয়প্রার্থীর সংখ্যা কম ছিলনা, কিন্তু শেষ অবধি সে যাকে বাছল, হবি তো হ তার পদবী সাহা। ঈশ্বর বলে যদি কেউ মাথার ওপর থেকে থাকেন, তিনি কম রসিক নন! যাইহোক, ও আর ওর ফিয়ার্সে — দুজনেই উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে আসার পর ওদের বিয়ে হয় বলে পদবী খোয়ানোর ব্যাপারটা এড়াতে পেরেছিল ও। এখনো নিজের জন্মগত পদবীই ব্যবহার করে। না করলে ওর নামটা কিঞ্চিৎ হাসির খোরাকই হতো — যেন মনঃস্থির করতে পারছে না ও সাহা না সাহা নয়। আমেরিকানদের মধ্যেও মাঝে মাঝে এ-জিনিস ঘটে। আমি এখানকার যে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম অধ্যাপনা করি সেখানে Tabitha Macmillan নামে একটি স্নাতকোত্তর ছাত্রী ছিল। সবাই ওকে সংক্ষেপে ডাকত ট্যাব বলে। ও পড়াশোনা শেষ করে চলে যাবার অনেক বছর পরে এক কনফারেন্সে ওর সঙ্গে দেখা হতেই নজর করলাম গলায় ঝোলানো পরিচয়পত্রে লেখা Tabitha Lloyd। জিজ্ঞেস করে জানলাম বছরখানেক হল বিয়ে হয়েছে ওর। বললাম, তাহলে তুমি এখন পুরোদস্তুর ট্যাবলয়েড হয়ে গেছ? শুনে খুব একচোট হাসল ও।

এতক্ষণ মানুষের আসল নাম স্মরণীয় হয়ে থাকার কথাই বললাম শুধু। কিন্তু আসল নামের চেয়েও স্মৃতিতে বেশীদিন স্থায়ী হয় লোকজনের দেওয়া মজার মজার ডাকনামগুলো। যেমন আমার বাবার অফিসে উঁচু পোস্টে চাকরি করতেন হিরণ্য সান্যাল বলে এক হাটপুষ্টি, বিশাল চেহারার ভদ্রলোক। অবস্থাপন্ন পরিবার তাঁদের, থাকতেন কাশীপুরে একটা বড় বাড়ীতে। তাঁর ছেলে আমারই বয়সী, তবে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে বলেই হোক অথবা অন্য কোনো কারণে, তার ভাবভঙ্গী ছিল একটু আহ্লাদী আহ্লাদী। ফলে অফিসের সহকর্মীরা আড়ালে তাঁকে বলতেন হিরণ্যকশিপু আর তাঁর ছেলেকে প্রহ্লাদ। এই ডাকনামটার জন্যই কিন্তু ভদ্রলোকের আসল নামটা আমার এখনো মনে আছে। আর ওঁর ছেলের শুধু ডাকনামটাই বেঁচে আছে, ভালনাম বিস্মৃতির অতলে। আমার ছোটবেলা কেটেছিল পূর্ব কলকাতার এক কেন্দ্রীয় সরকারী আবাসনে। সেখানে আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে দুজন সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারার ভদ্রলোকের ছিল একই নাম — প্রশান্ত পাল। একজনের গাট্টাগোটা ভারী শরীর, আর একজন লিকলিকে লম্বাটে। পাড়ার রসিক ছেলেছোকরারা এ-সুযোগ ছাড়বে কেন? তারা প্রথমজনকে বলত পালোয়ান (পাল-ওয়ান) আর দ্বিতীয়জনকে পাল-টু। এই দ্বিতীয় ভদ্রলোকের ছেলের ডাকনাম সত্যিসত্যিই লালটু হওয়ায় মজাটা দ্বিগুণ হত। তবে আসল মজা পালোয়ানবাবুর ছোট ছেলেটাকে নিয়ে। সে ছিল ভীষণ কাঁদুনে আর জেদী। তার বায়নার চিল-চীৎকার আশপাশের ফ্ল্যাট থেকেও শোনা যেত। তখন আমি বইয়ের পোকা, উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের মহাভারত সবে শেষ করেছি। চরিত্রগুলোর নাম ঠোটের ডগায়। হঠাৎ মাথায় এল, আচ্ছা, ওর নাম জেদী-রাজ শিশু-পাল দিলে কেমন হয়? ব্যস, বন্ধুমহলে বলতেই নামটা জনপ্রিয় হয়ে গেল। এবং দেখাই যাচ্ছে এখনো মনে আছে। তৎকালীন বাংলা চলচ্চিত্রের দুই সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোলেননি নিশ্চয়ই? সত্যজিত রায়ের বেশ কয়েকটি ছবিতে তাঁরা পার্শ্বচরিত্রে ছিলেন। একজনের বেশ মোটাসোটা চেহারা, অন্যজন প্রায় তাঁর অর্ধেক। ছোটবেলায় শুনতাম বাড়ীর বড়রা তাঁদের হাঙ্কা কথোপকথনে এঁদের যথাক্রমে পূর্ণসত্য আর অর্ধসত্য বলতেন। যাইহোক, ঐ সরকারী

আবাসনে আমি ছিলাম আমার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা আবধি। ততদিনে আমার পাড়াতে বন্ধু আর স্কুলের বন্ধুদের অনেকেই তামাক সেবনের ‘উপকারিতা’ বুঝে ফেলেছে, পকেটে চারমিনার বা উইলস্ ফ্লেক নিয়ে ঘোরে। এর মধ্যে পাড়ার একটি ছেলের নেশার মাত্রা ছিল একটু বেশীরকম। হয়তো পাড়ার মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, ফীল্ডিং করতে করতে মাঝেমাঝেই বাউন্ডারী লাইনের বাইরে গিয়ে খানিক ধোঁয়া টেনে আসত। তখন সহ-খেলোয়াড়রা ডাকাডাকি করলে বলত, ‘আরে দাঁড়া না, একটু রি-জুভেনেটেড হয়ে নিই, দম পাব।’ এইভাবে একদিন আমাদের মুখে মুখে ওর নাম হয়ে গেল ঋজু। এই ঋজুর বাবা মনোরঞ্জন-মেসো ছিলেন খুব আমুদে আর রসিক। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতেন, গাছপালা আর বাগান নিয়েই সময় কাটত। ওঁর দোতলার ফ্ল্যাটের ঐটুকু বারান্দায় ফুল আর ফলের এমন বাগান করেছিলেন যে সারা পাড়ার লোক ওঁর কাছে চারাগাছ নিতে আসত টবে লাগাবে বলে। আর একটা জিনিস ছিল তাঁর অতি প্রিয় – শিব্রাম চক্কোভির মতো কথা নিয়ে খেলা। ওঁর স্ত্রীর নাম আসলে সীমা, কিন্তু উনি পাড়ার কচিকাঁচাদের শেখাতেন ঋজুর মাকে ‘উল্টোমাসী’ বলে ডাকতে। আমরা অনেকে তাই করতামও। মাসীমা এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি বলতেন, ‘আরে, সীমামাসী বলে ডাকলে আর মজাটা রইল কোথায়? সীমামাসী উল্টোলেও তো সীমামাসী।’

স্কুলে আমাদের ক্লাসে পাঁচজন ইন্দ্রনীল ছিল। মুখাজী, ব্যানাজী, ভাদুড়ী, চৌধুরী আর পালিত। আমরা ওদের বলতাম পঞ্চপান্ডব। কিন্তু আমাদের এক অংকের মাস্টারমশাই ওদের ডাকতেন একেন্দ্র, দুয়েন্দ্র, তিনেন্দ্র ইত্যাদি বলে। তবে ইতিহাসের এক প্রৌঢ় শিক্ষক ছিলেন যাঁর আবার অভ্যেস নামের শেষে ‘ইন’ বা ‘এন’ থাকলেই সেটাকে ‘ইন্দ্রনাথ’ বানিয়ে দেওয়া। যেমন সত্যেনকে সত্যেন্দ্রনাথ, রমেনকে রমেন্দ্রনাথ, নীতীনকে নীতীন্দ্রনাথ। পড়া ধরা বা রোলকলের সময় তিনি ঐভাবেই বলতেন নামগুলো। তাই আমরাও নিজেদের মধ্যে ওঁর নাম দিয়েছিলাম ইন্দ্রবাবু। অবশ্য এর ফল ভুগতে হয়েছিল একবার একজনকে। অফ পিরিয়ডে টিচার্সরুমে ঐ ইতিহাসের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেই ঘরের বাইরে টুলে বসা আমাদের স্কুলের পিওন নিখিলদাকে যেই মুখ ফস্কে বলেছে ‘আমি ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই’ (তখন সেইরকমই নিয়ম ছিল -- সরাসরি টিচার্সরুমে ঢুকে পড়তে পারতাম না আমরা, দরজায় বসা শিক্ষাকর্মীদের মাধ্যমে ওঁদের ডেকে আনতে হত ভেতর থেকে), নিখিলদা অমনি বাংলার শিক্ষক নারায়ণবাবুকে ডেকে এনেছে, কারণ ওঁর আসল পদবী ইন্দ্র। যাইহোক, ঐরা ছাড়াও আরও কিছু মাস্টারমশাইয়ের ছাত্রমহলে প্রচলিত নামের কথা স্পষ্ট মনে আছে। যেমন, আমাদের দুজন শিক্ষকের নামের আদ্যক্ষর ছিল জি বি (গৌরাঙ্গ ব্যানাজী আর গৌতম বসু)। একজন খুব লম্বা আর অন্যজন ক্ষীণকায় ও খর্বকায়। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে ওঁরা ছিলেন ‘দীর্ঘজীবী’ আর ‘ক্ষীণজীবী’। আর একজন ইংরেজীর শিক্ষক আমাদের ইংরেজীতে কথোপকথনে চোস্ত করার জন্য আগাগোড়া ঐ ভাষাতেই কথা বলতেন। ক্লাসে তাঁর হাবভাব আর চালচলনে কেমন যেন একটু বিলিতি-বিলিতি গন্ধ ছিল। রোলকলের সময় খাঁটি সাহেবী কায়দায় ওপরের ঠোঁট না কাঁপিয়ে ঠোঁটের কোণ দিয়ে বলতেন ‘রেস্পন্ড’। ক্লাসের কিছু ফিচেল ছেলে তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ওঁকে ডাকত ‘জেম্স বন্ড’। সেই পৃথিবীবিখ্যাত গুপ্তচরের বহুলপরিচিত নম্বর যেহেতু ০০৭, তাই শেষ অবধি ঐ ০০৭-ই হয়ে গিয়েছিল তাঁর ডাকনাম।

ডাকনাম নিয়ে এমনতরো রসবোধ আমরা, মানে মার্কিনমূলকে উচ্চশিক্ষার্থে আসা আমি ও আমার চেনাশোনা বাঙালী ছেলেমেয়েরা, ধরে রেখেছিলাম আমাদের স্নাতোকোত্তর আর ডক্টরেট পর্যায়েও। আমি ছাত্রাবস্থায় যে ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, তার পরিসংখ্যান বিভাগে অধ্যাপক ডেভিড ডাল-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করত মাইক পোস্টেন নামে এক আমেরিকান আর রঘুরাম ভাট নামে এক ভারতীয়। ওঁদের যৌথভাবে লেখা গবেষণাপত্রগুলোকে আমরা বলতাম ‘ডাল, পোস্ট আর ভাট’। ঐ ইউনিভার্সিটিরই গণিত বিভাগে গবেষণারত দুই হাঙ্গেরিয়ান ছাত্র শান্ডর আর গাবর আমাদের বিভাগ থেকেও কয়েকটা ক্লাস নিতে আসত। সবসময় একসঙ্গে ঘুরত ওরা, একসঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করত, ক্লাসে পাশাপাশি বসত। যাকে বলে একেবারে অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। আমার এক বাঙালী সহপাঠীর উর্বর মস্তিষ্ক ওদের ডাকনামদুটোও করে দিয়েছিল অবিচ্ছেদ্য। সে ওদের আড়ালে ডাকত ঝাঁড়ের গোবর বলে। সেই ছেলেটির নিজের গবেষণা যাঁর তত্ত্বাবধানে, তাঁকেও সে রেহাই দেয়নি মজার ডাকনাম থেকে। ভদ্রলোকের আসল নাম Kenyon C. Garreth তাঁর রসিক ছাত্রের হাতে পড়ে হয়ে

দাঁড়িয়েছিল ‘কিনে আন সিগারেট’ । এ-দেশের বিখ্যাত জামাকাপড়ের দোকান জে সি পেনিকে যে বানিয়ে দিয়েছিল জগদীশ চন্দ্র পেনি, তার কাছে এর কম আর কী আশা করা যায়?

তাহলে মোদা কথা দাঁড়াল কী ? নাম জিনিসটা নামের অধিকারীর গুণে যেমন অমরত্ব পায়, তেমনি নিজগুণেও অক্ষয় হয়ে থাকে অনেকক্ষেত্রেই । অতএব বলুন — পৃথিবীতে স্থায়ী চিহ্ন ঐকে রেখে যেতে চান ? কোনো দরকার নেই বোকার মতো খেটেখুটে ঘামরক্ত বরিয়ে বিখ্যাত হবার । বা কারো হৃদয়ে নাম লেখার আশায় প্রেম নামক কাঁঠালের আঠায় আটকা পড়ে খামোখা দুর্ভোগ পোয়ানোর । শুধু একটু মাথা খাটিয়ে বেশ জম্পেশ, সুড়সুড়ি দিয়ে হাসানোর মতো, কটেক্স আর সেরিবেলাম — দুটোতেই একসঙ্গে গাঁথে যাওয়ার মতো একটা নাম বেছে নিন । তাহলেই কেবলা ফতে । যেমন ধরুন এই লেখাটাই যদি সুজয় দত্তের না হয়ে ‘জুতানন্দ বিন্দুপদাঙ্গুলি’ বা ঐরকম কোনো জমকালো নামওয়ালা লোকের হত, আরো অনেক বেশীদিন স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত না লেখকের নামটা ?

অবশ্য এক অর্থে এটা জুতানন্দ বিন্দুপদাঙ্গুলিরই লেখা । কারণ জুতা = Shoe, আনন্দ = Joy, বিন্দু = Dot আর পদাঙ্গুলি = Toe.



**সুজয় দত্ত** — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফরমেটিক্স) ওপর গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বই আছে । কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে । সাহিত্য তাঁর মনের আরাম । গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পুঁজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে । তিনি “প্রবাসবন্ধু” ও “দুকুল” পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন ।

“কি দেখেছি বাতায়নে  
পাগল করা ফুলের ঘ্রাণে  
লেখক কবির গুঞ্জরণে মনটা ওঠে ভ’রে  
নীল আকাশে সাদার ডেলা  
পুকুরপাড়ে কাশের মেলা  
পূজোর গন্ধে খুশীর খেলা জানলাটাকেই ঘিরে  
প্রতি বছর স্বস্তি ঝরাও, এই বাতায়ন ধ’রে !!”

মলাটটা খুবই সুন্দর হয়েছে, জানলাটা খুললে নিশ্চয়ই  
আরো ভাল দৃশ্য দেখা যাবে ।

অম্লান বসু (শিকাগো)



## স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

### মাঝি, পাখি আর ভালোবাসা

তিলে তিলে এগারো বছর, নৌকোর হাল ধরেছে মাঝি, বেশ শক্ত হাতেই। খেয়ালই করে নি কখন ছোট্ট ছই ঘেরা নৌকোটা তার জীবনে ভালবাসার ডিঙি নৌকো হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনে ছিল না এ নৌকো তার নয়, ওই আরাম বিলাসী বাবু বিবিদের বজরা এটা। কত যত্নে সাজায় রোজ সে তার ভালবাসাকে, সেই সূর্য ওঠা থেকে শুরু করে রাতের ঘুমপাড়ানি গান অবধি। বেশ মনে পড়ে যেদিন প্রথম হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিল দাঁড় গুলোকে, নিজেকে নববধূর মত লাগছিলো তার, নতুন সংসার, মাতৃ পিতৃ ঋণ শোধ করে এসেছে সাজিয়ে দিতে। সেই হাল ধরা শুরু। হাজার ঝড় ঝাপটাতেও তার ডিঙি অক্ষত। কোন কিছুতেই ভয় পায়নি ও। কিন্তু আজ ?? নৌকোর সাজ বদল হবে, অন্য সাজে সাজবে ওর ডিঙি। বাবু বিবিদের ইচ্ছে সেই প্রকারই। মাঝি বুঝে উঠতে পারেনা কি ভুল ওর !! বোবা কান্নাটা ঝাপটা মারতে চাইছে বারবার। হাত বোলাতে থাকে ওর ডিঙ্গির গায়ে। ওর গায়ের স্পর্শে আজো কেঁপে ওঠে মাঝি। চারপাশে যদিও তাকানো যায় শুধুই জল। আগে কখন জল মাপে নি মাঝি এইভাবে। ওর ডিঙিও আজ চুপ, স্থবির। নাঃ এই ডিঙি সাজবদল করলেও তারই, তাকেই ধরতে হবে হাল, তাকেই বাইতে হবে দাঁড়। ভোরের লাল সূর্যটা রং বদলাচ্ছে, অবগাহন দরকার।

মাথা তুলতেই দেখতে পেল কপালে কালো দাগ কাটা সাদা রঙের পাখিটাকে। যখনই সে পাড়ি দেয় পারাবার, মাথার ওপর গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, কখনো এসে বসে পাশাটিতে। টুকটাক কথাও হয় ওদের মধ্যে। ওর কাছে বসেই ডানা ঝাপটাচ্ছে। নৌকোর আকুলতায় ওর কথা মনেই পড়ে নি। একটু যেন অন্যরকম লাগছে ওকে। ওরও কি মন খারাপ? পাখিটা আস্তে আস্তে জল ছেড়ে ডাঙ্গায় পা বাড়ালো। কোথায় চলল ও !! বালির চরে একটা বালির বাসা, ছোট্ট, কিন্তু শান্ত, ঠান্ডা। ডানা মুড়ে ওই বাসার পাশে বসে এক দৃষ্টে মাঝির দিকে দেখছে ও। চোখ দুটো জলে জ্বলজ্বল করছে।

কুচিকুচি হয়ে ছড়িয়ে পড়বে জেনেও সমুদ্র অনবরত আছড়ে পড়ছে তীরে এসে। মাঝির ভাবনাগুলোও সেইরকম। মাথার চুলে একটাই রূপালী রেখা মানুষটার। এক অদ্ভুত মানসিক দ্বন্দ্ব। ভোরের হালকা কুয়াশায় একটা অদ্ভুত সকাল হয়। একটা কিষ্কৃত রাত নামে, জ্যোৎস্না পীড়িত, চন্দনহীন, স্মৃতিকাতরতায় ঘেরা। রাতে কখনো চোখ খুলে গেলে নিজের বুলন্ত শরীরটা দেখতে দেখতে একটা নিশ্চিন্ত ঘুম নেমে আসে চোখে। পাখিটা রাতজাগে.....



**স্নেহাশিস ভট্টাচার্য**। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বৃষ্টি সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে...

## লালী মুখার্জী

### ভয়

জোনাকী ডান হাতের বুড়ো আঙুল মুখে পুরে ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। পরণে শতছিন্ন ফ্রক। বয়েস সাত বছর। এই বয়েসে কেউ মুখে আঙুল দেয়না কিন্তু ও দেয়। ওই ছোট মাথাতে যখন অনেক কিছু ভয়, ভাবনা এসে জড়ো হয় তখন কেন যেন নিজের অজান্তেই ওর মুখে আঙুল চলে যায়।

ছোটখাট চেহারা, কালো রঙ, এক মাথা কৌকড়া চুল আর ঝকঝকে কালো চোখ। ওই চোখ দেখেই ওর মা নাম রেখেছিল জোনাকী। জন্মের পর থেকে এই ঘরেই ও বড় হয়েছে। এর চাইতে খারাপ ঘর এই বস্তুতে নেই। কি করে যে টিকে আছে সেটাই এক আশ্চর্য। ওর দাদু মাঝে মাঝে এদিক ওদিক থেকে ভাঙা টিনের টুকরো, হেঁড়া প্লাস্টিক জোগাড় করে ছাদ, দেয়াল কোনমনে একটু মেরামত করে। এই ভাবেই ওদের চলে যাচ্ছে। ওরা ছিল তিনজন সংসারে, গত দুবছর আগে মা মারা গেছে তারপর থেকে ওরা দুজন দাদু আর ও নিজে। মার কথা জোনাকীর মাঝে মাঝে খুব মনে হয়। মা লোকের বাড়ী ঠিকে কাজ করে অনেক কষ্টে সংসার চালাতো। ভালো কিছু কখনো দেখেনি বা পায়নি বলে জোনাকি কিছু না পেয়েই খুশী থাকত। একবার ওর মা একটা হাত হেঁড়া কাপড়ের পুতুল নিয়ে এসেছিল বোধহয় কোনো এক কাজের বাড়ী থেকে পাওয়া। আর জোনাকী, আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও বোধহয় এর চাইতে বেশী খুশী হতো না।

মা চলে যাবার পর দাদুকেই এখন সবকিছু করতে হয়। আগে বাড়ীতে থাকত জোনাকীর দেখাশোনা করবার জন্যে। এখন সকালে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যায়। জোনাকীকে বলা আছে সে যেন একা বা কারো সাথে কোথাও না যায়। একা ঘরে যখন আর থাকতে পারে না। তখন জোনাকী একটু রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চারিদিকে কত রকমের দোকান, কত লোক, কত গাড়ীর যাতায়াত দেখতে খুব ভাল লাগে। পাশেই একটা চায়ের দোকান, সেখানে একটা লোক থাকে যাকে দেখলে ওর ভয় হয়। ওর দিকে এমন ভাবে তাকায় যা দেখলে কি যেন এক অজানা আতঙ্ক এসে ওকে ঘিরে ধরে। লোকটা ওকে ডাকে বলে বেড়াতে নিয়ে যাবে। ইদানিং কিছুদিন হলো ওদের ঘরের কাছেও আসা শুরু করেছে। ওকে দেখলেই জোনাকী ঘরের ভেতরে এক কোনায় চলে যায়। দাদুর সাথে কথা বলে, “চলো খুকী আমার সাথে তোমাকে খুব ভাল জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব, বড় পুতুল কিনে দেব।” দাদু রেগে যায় বলে, “না না, ওর কোন পুতুলের দরকার নেই আর তোমার সাথে কোথাও ও যাবেনা।” কিন্তু দাদুও গত দুদিন হলো খুব জ্বরে শুয়ে আছে। মা মারা যাবার পর কোনোমতে ওদের দিনে একবার খাওয়া হয় কিন্তু দুদিন দাদু ভিক্ষে করতে যেতে না পারায় সেটুকুও হয়নি। গতকাল পাশের ঘরের এক বুড়ি ওকে দুটো শুকনো রুটি দিয়েছিল জোনাকী তার এক টুকরো দাদুকে খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। অনেক কষ্টে একটু জল খাওয়াতে পেরেছিল। আজ সকালে দাদুকে ডাকতে গিয়ে দেখে চোখ বন্ধ, কোনো আওয়াজ নেই। নাড়বার চেষ্টা করেছে পারেনি, বুঝতে পারল দাদু মারা গেছে। ওর মাকেও এইরকমই দেখেছিল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জোনাকী ভেবে যাচ্ছিল ও এখন কি করব। মা, দাদু কেউ নেই, ওতো আর কাউকে চেনেনা, জানে না, জানে না। সেই লোকটা আবার আসবে এবার জোর করে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে ও আর কখনও ফেরত আসতে পারবে না। মুখ থেকে আঙুল টা নামিয়ে জোনাকী আস্তে আস্তে দাদুর পাশে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল।



ছোটবেলায় হাতেখড়ি হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’ দিয়ে। সেই থেকেই বাংলা ভাষার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সবচাইতে প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল। পেশায় ছিলেন লাইব্রেরিয়ান, সিডনী ইউনিভার্সিটিতে; এখন অবসরপ্রাপ্ত। দেশ বিদেশ বেড়াতে খুব ভাললাগে। ভাললাগে হাজার হাজার বছরের পুরানো শহর ও তার স্থাপত্যশিল্প দেখতে। বাগান করা খুব প্রিয় কাজ আর তার সাথে পশু-পাখীদের খাওয়ানো ও তাদের সাথে ভাব জমানো।

## তিতাস মাহমুদ

### নিবারণের মা

ছেলেবেলায় আমি খুব দুরন্ত ছিলাম। এই কথাটিতে কোন বিশেষত্ব নেই। শৈশবে সব ছেলেরাই দুরন্ত থাকে। তবে আমার দুরন্তপনার জন্যে অনেককেই অযথা অনেক কষ্ট পোহাতে হয়েছে, সে কথা ভেবে খুব কষ্ট হয় আমার। আমরা থাকতাম চট্টগ্রাম চন্দনপুরা কলেজ কলোনির ১৪৩ নং বাড়িতে। আমার বাবা চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সেই সুবাদে সিনিয়র শিক্ষকদের জন্যে বরাদ্দ সরকারী কলোনির একটি তিন বেডরুম বাড়িতে আমার শৈশব কৈশোর কেটেছিল। সমবয়সী বন্ধু বান্ধবীতে ভরা ছিল কলোনির জীবন। আধবেলা স্কুল শেষ করে মার্বেল খেলা, দুপুর না গড়াতেই ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো আর শেষ বিকেলে মেয়েদের সাথে ‘ছি বুড়ি’ খেলা – এই ছিল আমাদের দৈনিক রুটিন। একবার এক মেয়ের ফ্রকের ভেতরে ‘বিছুটি পাতা’ ঢুকিয়ে দিয়েই দৌড়ে পালিয়েছিলাম। সেই মেয়েটি আজও আমার সাথে কথা বলে না। ক্রিকেট বলের আঘাতে কলোনির কত বাড়ির কাচের জানালা যে ভেঙ্গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। একদিন পোস্টমাস্টার কাকু যথারীতি চিঠি বিলি না করে সোজা আমার বাবার কাছে চলে গেলেন; কারণ তার কাছে নিশ্চিত প্রমাণ ছিল সাইকেলের পিছনে বাঁধা সবগুলো চিঠির বিদেশি স্ট্যাম্প আমি চুরি করেছি। এমন কিছু একটা ঘটবে, আমি তা আগে থেকে টের পেয়েছিলাম। সে সময় আমাদের কোন দেয়াল ঘড়ি ছিল না। সবকিছুই চলতো মসজিদের মাইকে আজানের ধ্বনিতে। মাগরিবের আজান পেরিয়ে সেদিন আকাশ ঘন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল আমি মায়ের কড়া আদেশ অমান্য করে তখনো বাড়ির বাইরে ছিলাম। আমি জানতাম আজ বাড়িতে আমার জন্যে মৃত্যু অপেক্ষা করছে। আমি ভয়ে কাতর হয়ে কলোনির রাস্তার ওপারে পোড়ো মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এমনিতে দিনের বেলাতেও আমরা ঐ মন্দিরে যেতে ভয় পেতাম; সেদিন আমার আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। হঠাৎ দেখি প্রাত্যহিক পূজো শেষ করে এক প্যাঁচে সাদা পাতলা সুতির কাপড় পরা নিবারণের মা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে আমি হাউ হাউ করে কেঁদে দিলাম। তিনি আমাকে যথাসম্ভব অভয় দিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলেন।

ডাকটিকিট সামান্য হতে পারে কিন্তু ‘চুরি করা’র ব্যাপারটা বাবা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। আমি এখন খুব বুঝি, সেদিন পোস্টমাস্টার কাকুর সামনে বাবা খুবই অপমানিত বোধ করেছিলেন। নিবারণের মাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে বাবা আমাকে বেদম প্রহার করেছিলেন। খুব মনে আছে আমাকে চড় খাঙ্গড়ের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে এই পঞ্চাশোর্ধ্ভ ভদ্রমহিলাও সেদিন আঘাত পেয়েছিলেন। জনের পর থেকেই নিবারণের মাকে আমি দেখে এসেছি। মহিলাদের যেমন প্রতিটি শাড়ির পেছনে একটি অ-বলা গল্প থাকে তেমনি আমার পিঠে অনেকগুলো ক্ষতের দাগ আছে; সে দাগের সবক’টি গল্প নিবারণের মায়ের জানা ছিল।

ইদানিংকালের কথা বাদ দিলে আমি আমার মাকে মায়ের চাইতেও বেশি পেয়েছি চশমা পরা স্কুল টিচার হিসেবে। ঘুম থেকে উঠে তিনি স্কুলে ছুটতেন, আমরা দুই ভাইবোন থাকতাম নিবারণের মায়ের কাছে। বাবা একবার বেরুলে রাতে কখন বাড়ি ফিরতেন আমি জানতাম না। মা অবশ্য স্কুল শেষে দুপুর গড়িয়ে বিকেলের শুরুতে ফিরে আসতেন। এভাবে যে যার সময়ে ফিরে আসতো কিন্তু নিবারণ আর কোনোদিন বাড়ি ফিরে আসেনি। আমরা কেউ জানতামনা সে কী পানিতে ডুবে না যক্ষ্মায় মারা গেছে। নিবারণের মাকেও কোনোদিন ছেলেকে নিয়ে কথা বলতে শুনিনি। তিনি বরাবরই নীরব এবং নিভৃত ছিলেন। আপন মনে আজানের শব্দ ধরে সংসারের মুখস্থ কাজ শেষ করে ঠিক এশার আগে একচালা ঘরে চলে যেতেন। পোড়ো মন্দিরের পিছনে ছিল তাঁর ঘরটি। দুপুরে ছাদে ভেজা কাঁথাকমল, জামাকাপড়, তোয়ালে ইত্যাদি রোদে উল্টে পাঁটে দিতেন। গোসলের পর আমার মাথায় নারকেল তেল মেখে চুল আঁচড়ে দিতেন। তারপর কাঁসার বাসনে কৈ মাছের কাঁটা বেছে ভাতের সাথে ঝোল আর আলু ভর্তা মেখে ছোট ছোট ‘ভাতবল’ বানিয়ে দিতেন। আমার এখনো মনে আছে, ভাতবল গুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। প্রথমটার নাম নীলকমল, পরেরটি নীল কমলের বড়’দা লালকমল। তার পরেরটা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা। সে রাজার এক অপরাধী রাজকন্যা আছে এবং অবধারিত ভাবে শেষ ভাতবলটি হতো সেই



রাজকন্যার নামে। কোনোদিন ওর নাম হতো মাধুরীলতা কোনোদিন কাঞ্চনমালা। শেষ বলটা খেয়ে ফেলা মানেই রাজকন্যার সাথে আমার বিয়ে হওয়া। একবার বাড়িতে বাবার একজন ছাত্র আমার সমবয়সী এক ছেলেকে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তখন বিকেল, আছরের আজান হয়েছে। বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘তিতাস, ওর নাম আবীর। ওর বাবা মা নেই। আজ থেকে তুমি আর আবীর, তোমরা বন্ধু হলে। যাও, ওকে নিয়ে মাঠে খেলাধুলো করে আসো।’ আমি আবীরের হাত ধরলাম। ও একটু ইতস্তত করছিলো। মাঠে যাবার আগে আমি অবাক বিস্ময়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওর কী একটা নিবারণের মা ও নাই?’ পাড়ার সবাই তাঁকে ‘নিবারণের মা’ বলেই ডাকতো। এতদিন পরে আমি ভাবছি অন্তত আমরা বাড়িতে ভাইবোন তাঁকে শ্রদ্ধা করে ‘মাসি’, ‘দিদা’ এমন কত নামেই তো ডাকতে পারতাম! কেন জানিনা, তা হয়নি। আসলে এমন যে তাঁকে আমাদের কখনো কোন নামে ডাকতে হয়নি। তাঁকে ডাকার প্রয়োজন হবার আগেই তিনি আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হতেন। তবে মনে আছে, কলোনির অনেকে আমাদের অন্দর মহলে একজন হিন্দু মহিলার আসা যাওয়া, তার হাতের রান্নাবান্না সহজভাবে নিতে পারতেননা। মাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, ‘আমি হিন্দু মুসলমান চিনি। আমার ঘরে যারা আসেন, আমি বিশ্বাস করি তাঁরা প্রত্যেকেই ভাল মানুষ। এই নিবারণের মা ছাড়া আমার পক্ষে স্কুল কলেজের চাকরি করে তিয়াসা, তিতাসকে বড় করা সম্ভব ছিলো না। নিবারণের মা ছিল বলেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ওয়ুর পানিটা সবসময় হাতের কাছে পেয়েছি।’

এরপর কখন যে কী হলো আমরা কিছুই জানলাম না। একদিন মায়ের কাছে শুনলাম বাবার চাকুরিতে প্রমোশন হয়েছে। আমরা চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকা চলে যাবো। সেটা ছিল ১৯৭৬ সাল। ফজরের আজানের পর আমাদের মালপত্র সব ট্রাকে তোলা শুরু হয়েছে। অবশ্য এর কিছুদিন আগ থেকে আমরা এ বাড়ি ও বাড়ি বিদায়ী ভোজ খেয়েছি। আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে কলোনির সবাই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসব বিদায় যজ্ঞেও নিবারণের মা ধীর স্থির, তাঁর নিয়মিত কাজ করে যান। আছরের আজান হলো। আমাদের গোছগাছ, বাঁধাসাজা চূড়ান্ত হয়েছে। আমাদের দু’জনকে কাপে করে দুধ ঢেলে দিলেন নিবারণের মা। আমার জন্যে আলাদা করে দুধের সর তোলা থাকে সেখানে খানিকটা চিনি ছিটিয়ে দিলেন। চলে যাবার আগে সবাই আমাকে গাল টিপে টিপে আদর করছে। আমি ভীষণ উত্তেজনা দুধ কিংবা সর কিছুই খেতে পারছিলাম না। আমি ঢাকায় যাচ্ছি, সেখানে আমার নতুন স্কুল হবে। শুনেছি, ঢাকার স্কুল বাড়ি থেকে বেশ দূরে হয়, পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না। আমি প্রতিদিন দু’বেলা রিকশা চড়তে পারবো, আমাদের ঢাকা বাসাতে একটা টেলিভিশন কেনা হবে .....এতো সবার ভেতরে নিবারণের মায়ের কথা মনেই ছিলনা। তাছাড়া ওঁনাকে পরিবারের বাইরের কেউ ভাবার কোন কারণ ছিলো না আমার। ঠিক সেই মুহূর্তে মা এসে বললেন, ‘পায়ে হাত ছুঁয়ে নিবারণের মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাও। মাগরিবের নামাজ পড়ে আমরা তোমাদের নানার বাড়ি যাবো। সেখান থেকে ভোরে ফজরের নামাজের পরে আমাদেরকে ট্রেন স্টেশনে যেতে হবে।’ সন্ধ্যা চলে পড়েছে। শৈশবের চিরচেনা চন্দনপুরা কলেজ কলোনি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি। রিক্সার পাদানিতে টুকটাক ছোট কয়েকটি ব্যাগ। বাবা রিক্সাচালককে একটু সাবধানে চালাতে বললেন। রিক্সাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার এপারে বাড়ির সামনের পোড়ো মন্দিরটাকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। আমার সেই ভয়াবহ রাতের কথা মনে পড়লো। যে রাতে এই মন্দির ছাড়া আমার আর কোথাও কোনো আশ্রয় ছিল না। আমাদের রিক্সা ডানে মোড় নেবার আগে আমি শেষবারের মতো মন্দিরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। সেখানে একটি মৃদু প্রদীপের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। এইতো আমি! আমার ডানপাশে দিনে পাঁচবার আজানের ধ্বনি অন্যপাশে পুজোর প্রদীপ হাতে সার্বক্ষণিকের জন্যে নিবারণের মা। কী আমার শৈশব! কী আমার কৈশোর! আমি বেড়ে উঠেছি দু’পাশের এই দুই অপূর্ব বৈভব আর বিস্তারিত ভিতর দিয়ে। বড় হয়ে আমি আর নতুন কোন ধর্মজ্ঞান অর্জন করিনি। হয়তো আমি ধর্মযাজক হতে পারিনি, তবে আমি অন্ধ নই।



**তিতাস মাহমুদ :** অনেকে বলেন তিতাস মাহমুদ পথ ভুলে ডাক্তারি পেশায় জড়িয়ে গেছেন। চিকিৎসক না হয়ে তিনি যদি সাহিত্যিক হয়ে লেখালেখি করতেন জীবনে তিনি অনেক বড় হতেন। এর উত্তরে তিতাস মাহমুদ বলেন, এ জীবনে কিছুই হওয়া হয়নি আমায়। কবিতার প্রতি অসম্ভব দুর্বলতা তার। কবিতা মানে এক মুঠো মুক্ত বাতাস, অপার প্রশান্তি। ইদানিং ফেসবুকে তার আবৃত্তির একটি ছোট অনুরাগী মহল তৈরী হয়েছে।

## রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)

### রাতের নগ্নতা

গল্পটা অন্যরকম হতে পারত। আজ বারো জুলাই, এই তারিখেই তো নিখিলেশের সাথে সুরভীর বিয়েটা হয়েছিল। অথচ সুরভী আজ এইদিনে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে নিজেকে লুকিয়ে রাখে দশ বছর ধরে।

সেইবার হানিমুনের ঘটনাটা সুরভীকে নিশ্চেজ করে দেয়! ঝরনার পাশেই তাদের হোটেল। দীর্ঘ সাত বছরের প্রেমের পর তাদের বিয়ে। নিখিলেশই তার একমাত্র ভরসার ঠিকানা। ঝরনার শৌ শৌ শব্দে কখন যে সে নিখিলেশের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায়। তার, নিখিলেশ পাশে নেই, দরজাটাও ভেজানো!

নাইটকোর্ডটা শরীরে জড়িয়ে বাইরের বেলকনিতে আসে। এখানেই গতরাতেও নিখিল দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল।

পুরো শৈলশহরটা দেখা যায় এখানে দাঁড়িয়ে। রাতের অন্ধকারে আলোগুলো মনে হয় যেন এক একটা নক্ষত্রপথ! সেকি পাশের রুম নম্বর দুশো তিরিশের দরজা খোলা কেন এত রাতে! কেমন যেন কৌতূহল হয় সুরভীর। এক পা এগিয়ে যেতেই আঁতকে ওঠে। কি বীভৎস সেই দৃশ্য, দুইজন নগ্ন, মানুষ! নিখিলেশ আর তার বসের স্ত্রী ঐন্দ্রিলা সেন... ছিঃ। দম আটকে আসছে সুরভীর। ভোরের ফ্লাইট ধরে রওনা দেয় সে।



**রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)** – জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির একটি প্রত্যন্ত গ্রাম সাপ্টাবাড়িতে জন্ম। বাংলা সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি করে এখন অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত আছি। তার সাথে লেখালেখি। দৈনিক কাগজ আজকাল, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, উত্তরের সারাদিনে লেখা প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে, আসাম হিলস টাইম ইংরেজি সংবাদপত্রে একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ হয়। এছাড়া “তিস্তা কন্যা পত্রিকা”র সম্পাদনা।

## ছন্দা বেওত্রা

### শীতের বন্দনা

গ্রীষ্ম প্রায় যাই-যাই করছে। গাছের পাতাগুলো অবর্ণনীয় হলুদ, কমলা, লাল রঙে সেজেছে। হাওয়ায় একটা তাজা ভাব, আলোটা একটু তীক্ষ্ণ, পায়ে তলায় শুকনো পাতার মচমচ। শীত এল বলে। পাঠকের অনেকেই হয়ত অভ্যাসবশত গ্রীষ্মের শোকে হাহুতাশ করেন, কিন্তু আমার কাছে শীত পুরনো বন্ধুর মত। অনেক অপেক্ষার পর আদর করে জড়িয়ে ধরি। আমার সন্দেহ আপনাদের অনেকেই হয়ত আমার মতই শীতপ্রেমী কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে খোলাখুলি বলতে পারেননা।

শীত বেচারার ভারি বদনাম। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতপ্রেমী, শতাব্দী ধরে সবাই বসন্ত আর বরষার বর্ণনায় ব্যস্ত। এটা কিন্তু খুব অন্যায়। পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশেই (ভারত, আফ্রিকা, এশিয়া ইত্যাদি) শীতকালটা সবথেকে আরামদায়ক। আমেরিকাতেও ভেবে দেখুন, বরফঝড়ার সময় প্রিয়জনের সঙ্গে কম্বল জড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে আড্ডা মারার আনন্দটাই আলাদা। তাই না?

শীতকালে লম্বা ঘুম দেওয়া যায়। ডেলাইট সেভিং টাইম মনে আছে তো? আমি আকুল অপেক্ষায় থাকি কবে সময়টা বদলাবে। আমার কাছে পুরো গরমকালটাই একটা লম্বা জেটল্যাগ।

শীতকালে খাওয়াদাওয়াও একটু ভালোমতো করা যায়। কয়েক পাউন্ড ওজন বেড়ে গেলেও কোই বাত নহি, ঝোলা কোট বা শালের তলায় দিব্যি ঢাকা দেওয়া যায়। গরমকালে কতো কাজ – লনের ঘাস কাট, শুকনো পাতা সাফ কর, আগাছা টেনে তোল, ছাতের গাটার সাফ করো। ফুলগাছের পরিচর্যা করো, চারাগাছের ডালপালা ছাঁট, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শীতকালে এসবের কোন ঝামেলা নেই – শুধু কখনো সখনো বরফ সাফ করা, ব্যাস।

শীতকালে ঘাম হয়না, মশা, মাছি, টিকের বালাই নেই। বাইরের পোকা, মাকড়শা সব মরে ভূত। বাড়ীর ভেতরে ইঁদুর, পিঁপড়ে, ব্যাঙ বা টিকটিকির আবির্ভাব নেই। কি আরাম বলুন!

শীতকাল উৎসবের সময়। হ্যালোউইন দিয়ে শুরু, ও ইস্টার-এ শেষ। মাঝখানে ঝাঁক বেঁধে থ্যাংকসগিভিং, ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার, ভ্যালেন্টাইন ডে, কত কী। আর গরমকালে? লেবার ডে, মেমোরিয়াল ডে আর জুলাই ফোরথে পিকনিক করা – গরম, হিউমিডিটি, মশা আর চিগার-এর কামড়, রোদে পোড়া, অ্যালার্জি, আর বীচে গেলে শরীরের সব সমস্যা ও অসমস্যা



বাগানে বরফ পড়ছে



পত্রহীন গাছে পানকৌড়ির ঝাঁক



জায়গায় বালি ঢোকা..... উঃ! গরমকাল পোষা জন্তু ও কমবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্যই ভাল, বয়স্কদের জন্য শীতকাল।

পাখি দেখা আমার একটা হবি। সেটাও শীতকালে অনেক সহজ। ঘন পাতার আড়ালে লুকোতে পারেনা আর প্রাকৃতিক খাবারের অভাবে খুব সহজেই বাগানে ফীডার ও জলের ফোয়ারার ধারে জড়ো হয়। অনেক পাখি সারা বছর একই জায়গায় থাকে।

আপনি কি খাটো শর্টস আর ট্যাঙ্ক টপের ভক্ত? ওসব কমবয়সী ছেলেমেয়েদেরই মানায়। বয়স্করাও পরেন বটে কিন্তু দেখতে মোটেই ভাল লাগেনা। তাছাড়া আছে শেভ করো, পেডিকিওর করো, কতো ঝামেলা।

বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নও অনেক সোজা শীতকালে। গরমের সময় শুধু বাড়ির ভিতরেই নয়, বাইরেটাও ঝকঝকে পরিষ্কার করে সাজানো দরকার – অতিথিরা এয়ার কন্ডিশন ছেড়ে বাইরে না গেলেও। শীতকালে বাইরের সবকিছু শুকনো পাতা ও বরফের নীচে চাপা রাখলেও চলে। শুধু বাড়ির ভিতরটা সাজিয়ে রাখলেই হোল।

গরমকালে একটা ‘কোথাও চলো, কোথাও চলো’ ভাব সবসময়। একটা ছটফটে তাড়াছড়ো যেন। সবাই পণ করেছে যে কোনও ভাবে একটা ফান বা মজার ছুটি পেতেই হবে – সে বীচেই হোক বা পাহাড়ে। ডিজনিরল্যান্ড বা নিউ ইয়র্ক বা হয়ত ইওরোপেই সই। কোথাও তো যেতেই হবে, সহকর্মী, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবরা সবাই যাচ্ছে যে, না গেলে চলে? ফেসবুকের পাতায় ছবি দেখাতে হবেনা? এই ‘কিছু একটা করার’ ভাবটা লম্বা দিনের আলোয় আরও বেড়ে যায়। রাত দশটাতেও ফটফটে আলো। ঘরে বসে থাকলে কুঁড়েমির অপরাধ। তারপর আছে বাচ্চাদের স্কুলের ছুটি, তাদেরও নিয়ে সারাদিন ক্যাম্প থেকে ক্লাসে ছোটোছুটি করতে হয়। জুলাই মাস থেকেই আমি শরীরে ও মনে ক্লান্ত। কবে গরম ফুরোবে তার জন্য দিন গুনি। আসে লেবার ডে, স্কুল কলেজ শুরু হয়ে যায়, জীবনটা আবার সঠিক তানে চলতে শুরু করে।

তবুও, আপনি যদি শীতের আলস্য একেবারেই সহ্য না করতে পারেন তাহলে বেরিয়ে পড়ুন – বরফের মধ্যেও স্কি, স্কেট বা স্লেড করার প্রচুর সুযোগ আছে। নিদেনপক্ষে বাইরের বরফটাই না হয় সাফ করুন – আপনার নিজের এবং (আমার মত) প্রতিবেশীরও। শরীর ও আত্মার উন্নতি।

তাই বলি, এস শীত, এস আমার প্রিয় ঋতু। তোমার শুভ্র আঁচলে ঢেকে দাও সব কুশ্রীতা, সব ব্যর্থ বাগানের পরিকল্পনা। ঢেকে দাও শরীরের সব মেদ, হাতপায়ের সব রোদে পোড়া বলিরেখা। ঝরো বরফ, ঝরতে থাকো, নিঃশব্দে, নরম পায়ে, শুষ্ক নাও সব শব্দদূষণ। তোমার শ্বেত আবরণে জড়িয়ে রাখো আমাদের বাড়ি গাছপালা। এই কটা মাস আমি একঘণ্টা বেশি ঘুমবো, আমাকে দুশোনা কেউ। আমি রোদ পোয়াবোনা, মাছ ধরবোনা, ছোটোছুটি করে বল খেলবোনা, আমি ঘাস কাটবোনা, আগাছা খুঁড়বোনা, টমেটোর চারা পুঁতবোনা...। আঃ, কি আরাম, কি শান্তি!



শীতের রোদুয়ে লাল টুকটুকে কার্ডিনাল



বরফ ঢাকা ডালের ওপর ছোট চিকিডি

## মমতা দাস

### গামছা বেত্তান্ত

ঘোর গরমে একটা শব্দই মনে আসে আমার, অতি প্রিয় বস্তু গামছা। গরমে ঘামতে ঘামতে মুখ হাত মোছার জন্য এর থেকে ভাল জিনিস হয় না, অন্তত আমি জানিনা! তবে হ্যাঁ, বোম্বোতে আফ্রেরী ওয়েস্ট-এ থাকতে আমাদের বাসার কাছে ‘সিলভার ওক’ বলে একটা রেস্টোরাঁয় ঢুকলেই এনে দিত ওডিকোলন দেওয়া ছোট্ট সাদা ভেজা তোয়ালে, সে বড় আরামের বস্তু ছিল! কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে ওডিকোলন আর কত ব্যবহার হয়! ওই মাথাটাখা ধরলে, অবরে সবরে আরকি! তাই সেই বিলাসিতার কথা থাক, আজ গামছার কথা! আমি বাপু একেবারে ছাপোষা বাঙালী মেয়ে! পোশাকে আমার সবচেয়ে পছন্দ শাড়ি। হিল্লি-দিল্লি, স্বদেশ-বিদেশ সব চক্কর দিচ্ছি শাড়ি পরে। বাড়িতে আমার সবচেয়ে পছন্দের জিনিস গামছা! স্নানের পর, অথবা ভাল করে মুখ-চোখ ধোয়ার পরে নরম একটা গামছা দিয়ে মুখ মোছার আনন্দই আলাদা! আসল কথায় আসি....

গামছার প্রচলন কবে থেকে হয় তা বোধ হয় একেবারেই অজানা। কোনো তথ্য নেই। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর উৎপত্তি ভারতের পূর্বাঞ্চল। ব্যবহারের দিক থেকে দেখলে অবশ্য প্রাধান্য দেওয়া যায় বাংলাদেশকে। তবে নামকরণ অবিভক্ত ভারত দেশেরই। নামের বিষয়টি বোঝা যায় এর শব্দ বিভাজন থেকে। সহজভাবে বলতে গেলে গা মোছা থেকেই গামছার উৎপত্তি। ভারতের নানা প্রদেশে এটা তৈরি এবং ব্যবহার হয়। অসমীয়া, বাঙালি, বিহারী এবং উড়িষ্যার মানুষেরাও ব্যবহার করে, অবশ্য অসমীয়া গামোচার সাথে গামছার পার্থক্য রয়েছে। গামোচার নাম এবং উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্যাকরণ মতে এর অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তু দিয়ে শরীর মোছার (কালিমা মোচন অর্থে?) কার্য। (শরীর + মচ্ = গামোচ/গামোছ)। গামছা একটি পাতলা, অমসৃণ সূতির কাপড় জাতীয় জিনিস বা তোয়ালে, যা ভারতের পূর্বাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, এবং বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত বস্তু। তামিলনাড়ুতে সাদা গামছার মত জিনিস যথেষ্ট সম্মানের, ধুতি-শাট-অঙ্গ বস্ত্র তাদের জাতীয় পোষাক! অভিজাত এবং প্রভাবশীল পুরুষরা ভালো সিল্কের লুঙ্গি আর হাফ হাত শাটের সঙ্গে ঘাড়ে সাদা গামছা নেবেই! যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের এই পোষাকে দেখা যাবেই! গ্রীষ্মের দাবদাহের দুপুর বা সন্ধ্যায় একটা স্নিগ্ধ স্নানের পর গামাখা মুছতে এটি ব্যবহৃত হয়। গ্রামদেশে বাইরে থেকে কেউ বাড়িতে এলে ঘটি-গামছা এগিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। অধিকাংশ গামছাতেই চেকের ব্যবহার দেখা যায়। তবে ডুরে গামছাও পাওয়া যায়। সাধারণত লাল, নীল, কমলা, সবুজ ইত্যাদি রঙের পাওয়া যায়। এটি তাঁতে বোনা হয়। আসামে সাদা কাপড়ে লাল বা কমলাসুতোর ফুলের কাজ করা পাড়দেওয়া গামছা ব্যবহার হয়। বিহ্ন নাচের সময় পুরুষরা এটি কোমরে এবং মাথায় বাঁধে! সাঁওতালদের মধ্যেও গামছার প্রচলন আছে। সেলাই করা বা ছাপা পাড়ের শুধু সাদা গামছা উড়িষ্যাতে রুমাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং কখনো গলায় জড়িয়ে রাখা হয়। এই উপমহাদেশে তোয়ালের তুলনায় গামছা জনপ্রিয় কেননা এটা অপেক্ষাকৃত সস্তা, নরম এবং ইউরোপীয় ঘরানার তোয়ালের মত মোটা নয়, পাতলা, যা এই উপমহাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ার সাথে মানানসই। ভাবো তো ঘোর বর্ষায় তোয়ালে শুকানো কত কঠিন। সেখানে আমাদের সাবেক গামছা, একটু শুকনো হাওয়া পেলেই কাপড় শুকানোর দড়িতে ঝুলে ঝুলে, দুলে দুলে, নেচে নেচে ঠিক শুকিয়ে যাবে, না কোনো গন্ধ, না কিছু, একেবারে ঝরঝরে!

বাঙালির জীবনে প্রায় ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গামছা, পূজোর ঘণ্টার উপরে আত্ম পল্লব, শিসওয়ালা কচি ডাব, তার গায়ে স্বস্তিক চিহ্ন আর উপরে ছোট্ট একটা ভাঁজ করা গামছা, এদৃশ্য সকলেই দেখেছে। অন্নপ্রাশনের (যে চেলি পরানো হয়, সেটাও তো গামছার-ই নামান্তর), বিয়ের গায়ে-হলুদের, উপনয়ন অনুষ্ঠানের একটা প্রধান উপকরণ নূতন গামছা। ধুতি-গেঞ্জীর সঙ্গে (আজকাল জিন্স-টিশার্ট) কোমরে গামছা বেঁধে শ্মশানযাত্রীরা শব নিয়ে যাচ্ছে থেকে শুরু করে, স্নান শেষে গা মুছতে, চুল ঝাড়তে কত কিছুতেই না গামছার ব্যবহার! মফস্বলে দেখেছি পাড়ার পুকুরে অবগাহন স্নানের সময় গামছা দিয়ে রগড়িয়ে গা ঘষে পরিষ্কার করতে (তাহলে আর গা-ঘষনী বা ধুঁধুল ফলের দরকার পড়েনা), স্নানশেষে অতি

যত্নে নিজের দেহ মুছতে, বাচ্চাদের গা মুছিয়ে দিতে ! তারপর গ্রাম্য সুন্দরী অতি যত্নে নিজের যৌবনকে শাসনের ঘেরাটোপ দিতেন গামছা গায়ে জড়িয়ে । স্নান সেরে, ভিজ়ে কাপড়ে, শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে গামছা জড়িয়ে, কলসী কাঁখে বঙ্গ সুন্দরীর ঘরে ফিরে যাওয়ার মনোরম দৃশ্যে মোহিত হয়নি, এমন পুরুষ ঝুঁজলে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না আমার । শৈশবে আরো দেখেছি প্রতি বৃহস্পতিবার পাড়ার মহিলাদের আলতা পরাতে আসত নাপতেনী, মায়েদের পা রগড়ে ধুয়ে (মেজে দিয়ে), গামছা দিয়ে বেশ যত্ন করে মুছে, তারপর নখ কেটে আলতা পরিয়ে দিত, আমরা ছোটরা মুগ্ধ হয়ে তাদের কাজকর্ম দেখতাম, যেন তারা রূপশিল্পী একেকজন । কান্দি শহরে আরেকটা ব্যাপার দেখেছি, গ্রামের হাটুরে বা অন্য কোন গ্রাম্য লোক শহরে এলে গামছায় মুড়ি বেঁধে আনত, তারপর খাওয়ার সময় বাঁধা মুড়ি কলের জলে ভাল করে ভিজিয়ে, বাতাসা বা গুড় সহযোগে খেয়ে নিত । এই কলকাতা শহরেও দেখি রিক্সা চালানোর প্রচলিত পরিণামের পর রিক্সাওয়ালারা গামছা দিয়ে মুখ-ঘাড়-হাত মুছছে, অথবা গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে ।

সব কিছু মতই গামছারও খারাপ ব্যবহার কিছু আছে বৈকি । সবচেয়ে নিরীহ হল, কোমরে গামছা পেঁচিয়ে ঝগড়া করা । হাতে বেশ করে গামছা পেঁচিয়ে কাউকে বেধড়ক পেটালেও নাকি পুলিশের বাবারও সাধ্য হবে না মারের ঘটনা প্রমাণ করার । শোনা কথা ভাই, ছাপোষা ভিত্তি বাঙালী আমি মার-পিট থেকে গা বাঁচিয়ে চলি । তারপর আছে গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করার কাহিনী, সেটা কে না জানে । আর গলায় গামছা পেঁচিয়ে খুন ? পণের জন্য নিরীহ মেয়ে, সম্পত্তির জন্য জ্ঞাতি খুন এসব তো যুগ যুগ ধরে চলছে । বাপরে, ভাবলেই গা শিউরে ওঠে । থাক এইসব ভয়ংকর কথা, মানুষ মানুষকে খুন করতে পারে, সেটাই তো আমাদের চিন্তার অতীত বিষয় । এক পাঠক বন্ধু খবর যোগান দিল ‘পশ্চিমবঙ্গে নানা জায়গায় গামছা তৈরী হয় বটে, তবে গুণমানে সেরা — বাঁকুড়া নদিয়া ও বসিরহাটের গামছা’ . . . । একটা কথা বলতে ভুলেগেছি আজকাল যে ছোট ছোট মেলা হয় সেগুলোতে গামছা বিক্রি হবেই । এমনকি খোদ কলকাতাতেও আমি দেখেছি । আর সুন্দাদু ফুচকা বিক্রেতার কাঁধে একটি তেলচিটে গামছা তো তার কৌলিন্যের পরিচয় বহন করে । অতএব . . . . জয় গামছার জয় । মিষ্টির দোকানের মালিক ও কর্মচারী, দুইপক্ষের-ই কাঁধে গামছা থাকতই, তার মানে অন্তত এই একটা ব্যাপারে কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না । ক্লাস সিস্টেম তুলে দিতেও তাহলে গামছা সাহায্য করতে পারত । তাই কি সাত তাড়াতাড়ি তোয়ালে এনে শ্রেণী বিভেদ বজায় রাখা ? কি জানি ।

সমাজের গরিব শ্রেণীর মানুষজন গামছাকে পরনের কাপড় হিসেবেও ব্যবহার করে অনেক সময় । তাছাড়া গ্রামের দিকে অনেক সময় গরমের দিনে খালি গায়ে থাকলেও, বাইরের কেউ এলে গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে নেয় পুরুষরা । এখনো গ্রামের মেয়েরা পুকুরে স্নান করে ভিজ়ে কাপড়ে উঠে আসার সময় একটা গামছা অবশ্যই জড়িয়ে নেয় গায়ে । গানবাজনা থেকে শুরু করে স্নান শেষে গা মুছতে, চুল ঝাড়তে কত কিছুতেই না গামছার ব্যবহার । এখনো গামছার চাহিদা কমেনি । যুগের হাওয়ায় পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা । এই গরমে গামছা স্বস্তি দেবেই ! নূতন অবস্থায় কড়কড়ে গামছা ধোয়ার পরে কি যে নরম ভালবাসার মত হয়ে যায়, সে এক পরম বিস্ময় ! আমার তো ঘোর গরমে খুব ভাল করে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে, বা স্নান করে, নরম গামছা দিয়ে চেপে চেপে মুখ-গা- হাত-পা মুছতে দারুণ লাগে ! আমি অবশ্য একটু গ্রাম্য ভাবের মহিলা । কিন্তু আড়াই হাতের গামছা থেকে এখন পুরো বারো হাতের গামছা-শাড়িও পাওয়া যায় শুনছি, আর সেটা নাকি রীতিমত ফ্যাশনেবল ব্যাপার, তবেই বোঝ ! আর সেই ছোট পুতুল পুতুল মানুষগুলো ! সাধারণ ঘরের খোকাখুকুরা, যারা গামছা পরেই পরিণত পুরুষ-নারীর অভিনয় করে তারা মালকোঁচা মেয়ে খোকারা বাড়ির কর্তা সাজে, আর শাড়ি-র মত করে পরে, মাথায় ঘোমটা টেনে খুকুরা গিল্লী, আহা কি অপরূপ সেই রূপ । আর মাথায় খোঁপা, বা লম্বা বেনুনি করতে গামছা তো লাগতই । আমারও বেঁধেছি তেমন । এই মধুর ছবির রেশ নিয়েই তাহলে শেষ করি আমার গামছা পুরাণ . . . ।



মমতা দাস (ভট্টাচার্য) — স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম । তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায় । জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন । দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা । যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে । মন খারাপ । তবু লিখে যাওয়া । তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ । ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া । বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ । সত্যত নিরন্তর সাহিত্য চর্চায় । পেশা নয়, নেশা ।



## মানস ঘোষ

### বাতায়নের চিঠি

“আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম । / রঙিন খামে যত্নে লেখা তোমার নাম ।” না, চিঠির সে সোনালি দিন আর নেই । প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়েছে হাতে লেখা চিঠির । অথচ আমাদের প্রজন্ম, যারা চিঠিপত্র যুগের শেষ প্রতিনিধি, তারা জানি চিঠি লেখার, চিঠি পাওয়ার যে কি আনন্দ ।

সেদিনের সেই লেখার আয়োজন, চিঠি পাওয়ার উচ্ছ্বাস, রোমাঞ্চ, চিঠি পড়ার ভালোলাগা আর উত্তরের প্রতীক্ষা সব মিলিয়ে যে আনন্দের আস্বাদ তা যেন আবারও ফিরে পেতে ইচ্ছে করে ।

তাই, বাতায়নের মাধ্যমে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, যাতে নানামাপের, নানা স্বাদের চিঠিতে, সেই ভালোলাগাটুকুকে একটু ছুঁয়ে আসা যায় ।

বিষয়বস্তু কখনো তথ্যনির্ভর আলোচনা কখনো বাস্তবের প্রেক্ষিতে কোনো রম্যরচনাও হতে পারে, তবে চিঠিগুলি মূলত কাল্পনিক, প্রাপক আর প্রেরকের নামগুলিও তাই । একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে নামকরণের রহস্য ।

এই সংখ্যায় প্রথম চিঠিতে আছে বাংলার এক মা'য়ের ‘সুপার মুন’ দেখার অভিজ্ঞতার কথা । সেই চিরন্তনী মা, যিনি তার শিশুটিকে ভোলাবার জন্য বলতেন, “আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা / চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ।”

দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছেন সাগর, গঙ্গা নদীকে । প্রেমপত্রই বটে, তবে দয়িতা বিশেষ ব্যক্তিত্বময়ী বলে খানিকটা যেন দাম্পত্য কূটনীতির আঁচও পাওয়া যাচ্ছে ।

(১)

ভাই ইন্দু, অনেকদিন এদিকে আইস নাই ।

এদিকে খোকাও বড় হইয়াছে । টিপ দিয়ে যাওয়ার সে সুখস্মৃতি অন্তর্হিতপ্রায় ।

শুনলাম আজকাল বড় সুপার হইয়াছ ! শুনিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল । বুঝিলাম না, তোমার নতুন কোন সমস্যা আসিয়া পড়িল কিনা । এমনিতে তো জলধরবাবুর অত্যাচারে প্রায়শঃই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয় ।

যাই হোক, মনের আশা আশঙ্কা চাপিয়া আমিও গিয়ে পৌঁছাইলাম, সুপার দেখিব বলিয়া । যদিও কাহাকেও আমার পরিচয় দিই নাই ।

আহা সে কি অপরূপ রূপ তোমার ! দেখিয়া আর আশ মেটে না । সবাই সে রূপ দেখিয়া আবেগতড়িত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল । কেহ রবি ঠাকুর আওড়াইতে লাগিল, কেহ বা অজ্ঞতা বশতঃ বঙ্কিমবাবুর সমুদ্রের রূপবর্ণনা থেকে “যদা যদা হি ধর্মস্য...”, কিছুই বাদ রাখিল না । নব্য যুবক যুবতী গণকে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইলাম, তাহারা এমত স্বর্গীয় দৃশ্যের দিকে পিছন ফিরিয়া, অনবরত নিজ ছবি তুলিতে ব্যস্ত রহিল ! ইহাকে নাকি “প্রায় স্বার্থপর ছবি” বলে ! এইসব ছবি নাকি মুখ-বইতে উত্তোলিত হইবে । ভাগ্যিস উহাদিগকে আমার পরিচয় দিই নাই !

ভিড়ের মধ্যে তোমার প্রতি একটি বিশেষ পরামর্শ শুনলাম । তাহা তোমায় জানাইবার সবিশেষ প্রয়োজন মনে করি ।

আবেগের বশে আমি একবার আক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, “এত সৌন্দর্য, এত সুপার, তবু কলঙ্ক যে মিটিল না” !

নব্য যুবকদের থেকে কেহ বলিয়া উঠিল “ওনাকে ফিলিমে নামতে বলুন, কলঙ্ক শীঘ্রই অলঙ্কার হইবে । সুপার হইতে মেগা, এমনকি ব্লকব্লাস্টারও হইয়া যাইতে পারেন ।”

উহাদের আমার পরিচয় দিই নাই, তাই উপায়টুকু জানিতে পারিলাম না। তোমাকে জানাইলাম, একটু খোঁজখবর করিয়া দেখিতে পার।

আজ এ পর্যন্তই, সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

ইতি, তোমার দিদি, চিরন্তনী।

(২)

প্রিয় জাহ্নবী, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমায় এ চিঠি লিখতে হচ্ছে। চিন্তা কোরো না, তোমার প্রেম ও সমর্পন নিয়ে আমার মনে কোন প্রশ্ন নেই। এমনকি তোমার সন্তানদের অনাচার আর অতিভক্তির ভার বহন করতে করতে তুমি যে শীর্ণ এবং ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়ছ, তা নিয়েও আমি কোন অনুযোগ জানাতে চাই না। অভিমান কোরোনা। আমি এরকমই। নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। আর তাই হয়তো তুমি বার বার ফিরে ফিরে আসো আমার কাছে!

এই মধ্যবয়সেও তোমার চলার বিভঙ্গ, তোমার কূল ছাপানো সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। সেই রূপ নিয়ে কত কবি যে কত কবিতা, গান লিখলেন তা গুনে শেষ করা যাবে না। তোমার সান্নিধ্য মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে আলোড়িত করে, আবার কারো কারো সামনে খুলে দেয় ঈশ্বরচিন্তার দুয়ার।

কিন্তু.... ইদানীং কি যে হয়েছে! গুজবে যে কান পাতা দায়! তুমি নাকি আজকাল আরও সেজে উঠতে চাইছ। বাঁধানো পাড়, দুধারে উদ্যান, তাতে মনোরম আলো, আরও কতকিছু। কৃত্রিম সে সৌন্দর্যায়ন। আর তাতেই নাকি খুব মজেছে তুমি! কার জন্য এত সাজগোজ মিতা!

আমি কি কখনো তোমাকে অবহেলা করেছি? আমাদের সঙ্গমে তুমি যে অপরূপা হয়ে ওঠ সে তো মিথ্যে নয়! যৌবন জোয়ারে তোমার যে রূপের প্লাবন তা কি কোন অংশে কম?! মানছি সে কৃতিত্ব শুধু আমার নয়, তোমার বান্ধবী শশিকলার সযত্ন রূপ 'টান' ও তোমায় আরো মোহময়ী করে তুলেছে।

বড় ভয় হয় জাহ্নবী, এতটা দূর্গম পথ পেরিয়ে তোমায় আসতে হয় আমার কাছে, না জানি কবে কি হয়। এমনতেই তো গুনি, আজকাল উষ্ণায়নের ভয়ানক দৌরাত্ম্য আর ক্রমাগত শাসানি, এমনকি ধরণীকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। হয়তো কোনদিন তোমার চলার পথই যাবে পাল্টে, অথবা অবরুদ্ধ হবে ভয়ানক কোনো কারনে। এ ব্যাপারে আমাদের পরম-হিতৈষিনী মোহনাও খুব চিন্তায় আছে।

আরেকটা কথা বলার ছিল,....

ঐ যে খামখেয়ালি ছেলেটি,..... 'বাদল' না কি যেন একটা নাম... ওর দামালপনায় এতো ক্রোধান্বিত হয়ে না। সংঘর্মের বাঁধ ভাঙলে, শুধু তোমার নয় তোমার সন্তানদেরও প্রভূত ক্ষতি হয়।

আজ এইপর্যন্ত। অপেক্ষায় আছি, কখন আবার তুমি আসবে। আমার বুকো মাথা রাখবে। ধুয়ে যাবে সব অনুযোগ, অভিযোগ, অভিমান..... নোনা জলের ঢেউয়ে। এক সুনামি ভালবাসা নিও।

ইতি, সাগর।



**মানস ঘোষ**। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের “ট্রেনচালক”। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ব করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা ‘বাতায়ন’ পাশে, আমাদের মাঝে।

## সিদ্ধার্থ দে

### কোন পুরাতন স্মৃতির টানে

#### মুখবন্ধ :

জীবনে এমন কিছু দিন আসে যেগুলির খুঁটিনাটি অনেক কিছু বহুদিন পর্যন্ত মনে থাকে। যেমন যেদিন মানুষ প্রথম চাঁদে পা রাখল, বা ইন্দিরা গান্ধীর নিহত হলেন। বা প্রিয়জন বিয়োগের বা সম্ভানের জন্মের দিনগুলি।

আমি ক্রিকেট পাগল, এই খেলা ঘিরে আমার স্মৃতিতে ঐ ধরণের কয়েকটি দিনের কথা লিখব আজ। প্রত্যেকটিই আমার মতে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের এক একটি মাইলফলক। ক্রিকেট ভালবাসা পাঠকরাও হয়তো দিনগুলির কথা মনে করতে পারবেন। অবশ্য এ লেখার কয়েকটি দিন হয়তো বহু পাঠকের জন্মের বা জ্ঞানোদয়ের আগে।

দিনগুলির কথা কালানুক্রমিক ভাবে লিখলাম:

#### বুধবার, ২৩ অগস্ট, ১৯৭১, স্থান: কলকাতা

ক্লাস টেনে পড়ি তখন। যতদূর মনে পড়ে, সেদিন স্কুলে গিয়েছিলাম। দিনটা ছিল বুধবার, ২৩শে অগস্ট, ১৯৭১। এক মন খারাপ করা মেঘলা দিন। ইংলন্ডের ওভাল মাঠে ভারত বনাম ইংলন্ডের টেস্ট ম্যাচ চলছে। চতুর্থ দিনের খেলা। যে সময়ের কথা বলছি – বিদেশে তো কোন ছাড়, দেশেও ভারত কালেভদ্রে জিতত। ইংলন্ডের প্রথম ইনিংসে ৩৫৫ রানের উত্তরে ভারত ৭১ রানে পিছিয়ে প্রথম ইনিংস শেষ করেছে। বি বি সি থেকে ধারাবিবরণী সম্প্রচারিত হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা টাউস মারফি রেডিওটাতে রিলে শুনছি। মনে আছে, ঘরের টিউব লাইটটা খারাপ ছিল। কম পাওয়ারের একটা হলদে আলো জ্বালা ছিল। উঁচু ক্লাসে পড়ি – পড়তে বসার সময় তখন।

বসে যেতামও হয়তো। যদি না একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটত। ইংলন্ড যখন ৭১ রানে এগিয়ে খেলা শুরু করল সম্ভাবনা ছিল দুটো – এক ইংলন্ডের জয়, বা কোনরকমে ড্র। কিন্তু ভগবত চন্দ্রশেখর নামে এক লেগ স্পিনারের কিছু অন্য পরিকল্পনা ছিল। কিছু বোঝার আগেই ১০১ রানে সাহেবরা খতম। চন্দ্র ৩৮ রানে ৬ উইকেট নিলেন। সেদিন সন্ধ্যার পড়াশুনা মাথায় উঠেছিল। দিনটিকে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের একটি মাইলফলক বললে অতুক্তি হবে না। সেদিন প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম, সাহেবদের দেশে গিয়ে আমরা ওদের পর্যুদস্ত করতে পারি! পরদিন প্রয়োজনীয় ১৭৩ রান করে ভারত টেস্টটি জেতে চার উইকেটে। ইংলন্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম টেস্ট এবং সিরিজ জয়।

#### মঙ্গলবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯, স্থান: কলকাতা

১৯৭৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর তখন কলকাতায় চাকরি করি। মাসখানেক হল বাবার ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়েছে। শারীরিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হচ্ছে।

ঐ দিন ভারত-ইংলন্ডের সে বছরের সিরিজের চতুর্থ ও শেষ টেস্টের শেষ দিন। মরসুমটা ভারতের ভাল যায়নি – ইংলন্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বের তিনটি খেলাতেই ভারত হেরে বিদায় নিয়েছে। এমনকি সেই সময়ের টেস্ট না খেলা শ্রীলঙ্কা অবধি আমাদের হারিয়েছে। টেস্ট সিরিজের প্রথম খেলাতেও বিশ্রীভাবে হারে ভারত, পরের দুটি মূলতঃ বৃষ্টির কারণে অমীমাংসিত থাকে। চতুর্থ টেস্টেও কোন উল্লসিত হবার কারণ ছিলনা। ইংলন্ড অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি ৪৩৭ রানে এগিয়ে থেকে ডিক্লেয়ার করেছেন – ক্রিকেটের ইতিহাসে কোন দল চতুর্থ ইনিংসে অত রান করে জেতেনি। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের রান ৭২-০। গাভাসকার ও চেনন চৌহান ব্যাট করছেন। একেই সর্বক্ষণ বাবার অসুস্থতার জন্য মন খারাপ, আর একটা হারের ধারাবিবরণী শুনতে বিশেষ ঔৎসুক্য ছিলনা। আর সেই আমলে এক দিনে ৩৬২ রান করাও প্রায় অসম্ভব ছিল।



তা-ও কাজ থেকে ফিরে চা জলখাবার খেয়ে ট্রাস্টিসের রেডিওটা খুললাম। একটু অবাক হলাম – লাঞ্চার পরের খেলা চলছে। দুই ওপেনার তখনো ক্রিজে। রান দুশ ছুঁই ছুঁই। তবে আশান্বিত হবার কোন কারণ দেখিনি। অবশ্য রেডিও বন্ধ করিনি – ভাবলাম দেখা যাক কি হয়। বড়জোড় হারবে এই তো! একটু স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি – চৌহান আউট হলেন ২১৩ রানের মাথায়। ভাবলাম ব্যস এবার ধস নামল। কিন্তু গাভাসকরের সেদিন অন্য মেজাজে। আর এক মারাঠি ভেঙ্গসরকারকে নিয়ে নতুন করে জুটি বাঁধলেন। চা-এর বিরতির সময়ে ৩০৪/১। এবার সত্যিই নড়ে চড়ে বসলাম। দুই মারাঠি দাপটে ব্যাটিং করছেন। ৩৬৬/১। সত্যি শুনছি তো, নাকি খোয়াব দেখছি? মাত্র ৭২ রান দরকার – হাতে নটা উইকেট। বাকি ১২ ওভার।

হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে ঘামতে ঘামতে অসম্ভবের প্রতীক্ষায় উন্মূখ। কিন্তু ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে হাসছিলেন। ভেঙ্গসরকার হঠাৎ একটা আলাগা শট খেলে আউট হয়ে গেলেন। তার কিছু পরে গাভাসকরের ২২১ রানের এপিক ইনিংসটির অবসান ঘটল। তারপর যা হয়, প্যাভিলিয়নে ফেরার মিছিল। খেলা শেষ হল ৪২৯-৮এ। মাত্র ৯ রানের জন্য সেদিন ইতিহাস রচিত হল না। দেশভক্ত ইংরেজ আম্পায়াররা নাকি সেদিন ভালই কারচুপি করেছিলেন – আর ব্রিয়ারলি হারের সম্ভাবনা আঁচ করে আরামসে সময় নষ্ট করেছিলেন। তা না হোক, লোডশেডিং-এর সেই সন্ধ্যোটা আমার স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল হয়ে রইল।

**২৫ জুন, ১৯৮৩, শনিবার। স্থান: লিবিয়া।**

১৯৭৯র বিশ্বকাপে ভারতের নৈরাশ্যজনক ফলের পর ১৯৮৩র বিশ্বকাপে বিশেষ কোন প্রত্যাশা ছিলনা। তখন আমি কাজ করি উত্তর আফ্রিকার লিবিয়াতে – ফ্ল্যাটের সামনেই ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূল। উত্তর প্রান্তে ইউরোপ। চেষ্টা করেও দেশটাকে ভাল লাগাতে পারছি না – কারখানার শিফট ডিউটিও একঘেঁয়ে এবং ক্লান্তিকর। বিনোদন বলতে একটি রেডিও যুক্ত ক্যাসেট প্লেয়ার। সঙ্গে আনা গুটি কয়েক গানের ক্যাসেট বার বার শুন। রেডিওর আরবি প্রোগ্রামের বিন্দুবিসর্গ বুঝি না। তবে বিশ্বকাপের সময়ে যন্ত্রটি হঠাৎ কাজে লেগে গেল। ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইংলন্ড থেকে আসা বিশ্বকাপের ধারাবিবরণী মোটামুটি স্পষ্টই শুনতে পেলাম। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, ক্রিকেট এক ঐশ্বর্যময় অনিশ্চয়তার খেলা। কথাটার প্রমাণ পেলাম, একের পর এক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে যখন ভারত ফাইনালে পৌঁছে গেল। সেদিন আমার নাইট শিফট ছিল। রাত নটা থেকে ডিউটি। সুতরাং শুরু থেকেই রিলে শুনতে পেরেছিলাম। (সময়ের হিসাবে লিবিয়া আর ইংলন্ডের মাত্র এক ঘন্টার ফারাক।)

তখন একদিনের খেলা হত ৬০ ওভারে। ভারত প্রথমে ব্যাট করে ১৮৩ তে সকলে আউট ৫৪ ওভারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের চার মুখ্য বোলার সেই ভয়াবহ চতুষ্টয় – মার্শাল, রবার্টস, গার্নার, হোল্ডিং। ধরেই নিয়েছিলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঐ কটা রান তুলে দেওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা, যেখানে প্রথম চার ব্যাটসম্যানের নাম গ্রিনিজ, হেন্স, রিচার্ডস, লয়েড। কপিল দেব বাদে আমাদের চার বোলার মদনলাল, বলবিন্দর সান্দু, রজার বিনি ও মহিন্দর অমরনাথ। শুরুতেই অবশ্য গ্রিনিজ অল্প রানে আউট হয়ে যান, কিন্তু তারপর হেন্সের সঙ্গে জুটি বেঁধে রিচার্ডস স্বভাবসিদ্ধ রাজকীয় মেজাজে পেটাতে থাকেন। স্কোর ৫০-১। হেন্সকে তুলে নিলেন মদনলাল। ৫৭ রানের মাথায় এলো সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মদনলালের এক কম গতির বাউন্সার হুক করতে গিয়ে রিচার্ডস টাইমিং-এ ভুল করে ফেললেন। অনেকখানি দৌড়ে কপিল দেব একটি অবিস্মরণীয় ক্যাচ ধরলেন।

এরপরের কাহিনী সবাই জানেন। পুনরুজ্জী করলাম না। শুধু কোথায় যেন পড়ছিলাম রিচার্ডস-এর হুক শটটি যদি কপিল ধরতে না পারতেন, বা ছক্কা হয়ে যেত, আই পি এল-এর আজকের রমরমা বোধহয় থাকত না। বলাই বাহুল্য, সেদিন নাইট শিফট মেশিনপত্রের দিকে বিশেষ মন ছিল না। গুন গুন করে উত্তর আফ্রিকার নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে হাঁটতে হাঁটতে গান গেয়েছি



“কি আনন্দ আকাশে বাতাসে !”

রোজ কত কিছু ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয়না আহা !

**মঙ্গলবার, ১৭ই মার্চ, ১৯৮৭, স্থান: ফরাঙ্কা ।**

দিনকয়েকের জন্য ফরাঙ্কায় বেড়াতে গিয়েছিলাম শ্যালিকা ইন্দ্রানী ভট্টাচার্যের বাড়ি। সেখানেই ওর স্বামী চিন্ময়ের কর্মস্হল ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কর্পোরেশনে।

সেসময়ে টেলিভিশন অনেক বাড়িতেই এসে গেছে। ঘরে বসে সরাসরি টেস্ট খেলা দেখার প্রথমদিকের শিহরণটা আর নেই ততটা।

কোন কারণে চিন্ময়ের অফিসে বসে দুপুর বেলা রেডিওতে ধারাবিবরণী শুনছিলাম। কেন, তা আজ আর মনে নেই। ঘরে চিন্ময়ের আরো দুজন সহকর্মীও ছিলেন। ভারত বনাম পাকিস্তানের পাঁচ টেস্টের সিরিজের শেষ টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলছে। এই দুই রাষ্ট্রের খেলায় কোন দেশই হারতে চায়না। সেইরকম উইকেটও বানানো হয়েছে – ফলে আজ অবধি ৫৮টি টেস্টের ৩৮টিই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। আলোচ্য সিরিজে প্রথম চারটি টেস্টই ড্র হয়েছে।

বাঙ্গালোরের শেষ টেস্টের প্রথম দিন থেকেই বোঝা গিয়েছিল এ খেলার মীমাংসা হবেই বৃষ্টি বাধ না সাধলে। রীতিমতন বোলার সহায়ক, ‘মাইন ক্ষেত্র’ বললেও অতুজ্জি হবে না। পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ১১৬ রানে সকলে আউট, ভারতের উত্তর ১৪৫। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের ২৪৯, ফলে ভারতকে জেতার জন্য চতুর্থ ইনিংসে করতে হবে ২২১। সহায়ক উইকেটে পাকিস্তানের দুই স্পিনার তৌসিফ আহমেদ আর ইকবাল কাশিমের দাপটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা একে একে আত্মসমর্পন করছেন। কিন্তু নিয়মিত উইকেট হারানোর মাঝে এক ৩৭ বছরের মারাঠি এক দিকে প্রাণপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি রানই কষ্ট করে পাওয়া। রেডিও ঘিরে শ্রোতারা প্রতিটি রানেই হাততালি দিচ্ছি। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ৯৬ রানে সবার শেষে আউট হলেন জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে। ভারত মাত্র ১৬ রানে হেরে টেস্ট ও সিরিজ হারল, কিন্তু সুনীল মনোহর গাভাসকর ক্রিকেট খেলাকে দিয়ে গেলেন শিক্ষণীয় ধৈর্য, মনোঃসংযোগ এবং টেকনিকের প্রদর্শনী। পরবর্তী জীবনে যখন মাঝে মধ্যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে গাভাসকরের এই ইনিংসটির কথা স্মরণ করেছি।

**মঙ্গলবার ১৩-ই মার্চ ২০০১ - বৃহস্পতিবার ১৫ই মার্চ ২০০১, স্থান: ক্যানবেরা।**

অস্ট্রেলিয়া তখন ক্রিকেট দুনিয়া কাঁপাচ্ছে। একাদিক্রমে ষোলোটি টেস্ট জিতেছে – যা খেলাটির ইতিহাসে কখনো হয়নি। ষোল নম্বর জয় আবার ভারতের মাঠে – মুম্বইতে। স্টিভ ওয়-র দল সৌরভের ভারতকে হেলায় হারিয়েছে ১০ উইকেটে।

দ্বিতীয় টেস্ট কলকাতায়। শুরু হয়েছিল একইভাবে – প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়ার ৪৪৫ রানের উত্তরে ভারতে ইনিংস মাত্র ১৭১ রানে শেষ। ২৭৪ রানে এগিয়ে থেকে ভারতকে ফলো অন করালেন উও। সেদিন মঙ্গলবার, ১৩ই মার্চ। খেলার তৃতীয় দিন। ছটা নাগাদ অফিস থেকে ফেরার পর থেকে ABC-র ধারাবিবরণী শুনছি। (গরমকালে ভারতের সঙ্গে তফাত সাড়ে পাঁচ ঘন্টার)। ধরেই নিয়েছিলাম এই টেস্টেও লজ্জাজনক হার হবে। তেডুলকর যখন আউট হলেন ১১৫-৩। ভাবলাম সব শেষ। প্রথম ইনিংস-এ ভাল খেলার দরুণ তিন নম্বরে নামা লক্ষণের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন সৌরভ। কিন্তু দিনের শেষের দিকে আউট হয়ে গেলেন ভারতের অধিনায়ক। ২৩২-৪। তখনো ৪২ রান প্রয়োজন ইনিংসে হার এড়ানোর। মাঠে এলেন বেশ খারাপ ফর্মে থাকা রাহুল দ্রাবিড়। দিনের শেষে ২৫৪-৪।

১৪ই মার্চ আমাদের সময় দুপুর তিনটে নাগাদ খেলা শুরু হল। কিছুই আশা করিনি। কিন্তু সেদিন ইডেনে যাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ করলেন সারাদিন ধরে লক্ষণ-দ্রাবিড়ের স্বপ্নের once in a lifetime জুটি। সাবধানে শুরুর পর একের পর এক

পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করলেন এই দুই কিংবদন্তি। দিনের শেষে ৫৮৯-৪। ৩১৫ রানে এগিয়ে ভারত। একদিন খেলা বাকী। দিনের শুরুতে যা অঙ্কের মধ্যেই ছিল না, সবার মনে একই প্রশ্ন – গাঙ্গুলি কখন ডিক্লেয়ার করবেন পরদিন। ১৫ই মার্চ দিনটাকে শেক্সপিয়ার চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন জুলিয়াস সিজার নাটকে। দিনটাকে বলা হয় “Ides of March”। ঐদিন রোমান সম্রাটকে হত্যা করেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত কিছু মানুষ – যাঁদের মধ্যে ব্রুটাসও ছিলেন। তাঁকে কিন্তু এক জ্যোতিষ সাবধান করে দিয়েছিলেন ঐ দিনটির ব্যাপারে একটি চিরকুট মারফত – যাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা ছিল “beware the Ides of March!” গর্বিত সিজার সেই সাবধান বার্তাকে পাত্তা দেন নি।

২০০১ সালের Ides of March-এ অবশ্যই স্টিভ ওয়-কে কোন ভবিষ্যতদ্রষ্টা সাবধান করেন নি। অঘটন ঘটার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে হয়তো পারেন নি, কিন্তু দিনটাতে কি হতে চলেছে স্টিভ কেন – ক্রিকেট দুনিয়ার কেউ-ই আন্দাজ করতে পারেন নি মনে হয়। আমার মনে হয়েছিল শেষ দিনে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সময় ব্যাট করে সৌরভ ম্যাচটাকে ড্র-এর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিনটা আদতে ছিল ভারতের। হরভজনের স্পিনের মোকাবিলা করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ানরা। ২১২ রানে সবাই আউট। ১৭১ রানে অভাবনীয় জয় টিম ইন্ডিয়ার। জেতার পর এমনই ছেলেমানুষের মত নাচানাচি করেছিলাম যে সেই সময়ে ছয় বছরের পুত্র এখনো মনে রেখেছে। এই স্মরণীয় ম্যাচটির পর ফলো অন করানোর ব্যাপারে অধিনায়কদের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। দেখেছি শেষ দিনের ভাঙা উইকেটে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ব্যাট করার ঝুঁকি নিতে চান না অনেকেই। অবশ্য ক্রিকেটের ইতিহাসে মাত্র তিনবার ঘটা এই ধরনের অবিশ্বাস্য ফলের আর পুনরাবৃত্তি হয়নি। অস্ট্রেলিয়ানরা খেলার মাঠে জান লড়িয়ে দেন – কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের লড়িয়ে খেলোয়াড়দের সমাদর করেন। সেদিনের এক হিরো লক্ষণকে তাই ইয়ান চ্যাপেল আদ্যক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে অভিহিত করেছেন Very Very Special নামে। আর দ্রাবিড় আমন্ত্রিত হয়েছেন Bradman Memorial Lecture দেওয়ার জন্য। দেখত দেখতে দিনটি দু দশক পিছনে। আজও অনেকে এই খেলাটির প্রসঙ্গ উঠলে গর্বের সাথে বলেন “আমি সেদিন ইডেনে ছিলাম – I was there!”

### ১৩ই জুলাই ২০০২ শনিবার, স্থান: ক্যানবেরা

টানটান একদিনের ম্যাচ বহু দেখেছি, যেগুলিতে শেষ ওভারের শুরুতেও তিন রকম ফল সম্ভবপর ছিল। ২০০২ সালের ১৪ই জুলাই- এর এক হিমেল রাতে ক্যানবেরাতে লাউঞ্জ রুমে চাদর মুড়ি দিয়ে এমনই এক খেলা দেখছিলাম।

খেলাটি আসলে হয়েছিল ১৩ই জুলাই ২০০২ তে ক্রিকেটের মক্কা লর্ডস মাঠে। সময়ের ফারাকের জন্য অস্ট্রেলিয়াতে অবশ্য খেলা শেষ হয়েছিল মাঝ রাতের ঘন্টা তিনেক বাদে ১৪ই জুলাইতে। ভারত ম্যাচটি দু উইকেটে জিতেছিল তিন বল বাকি থাকতে ৩২৬ রান তাড়া করে।

খেলাটির বিস্তারিত বিবরণে গেলাম না। দিনটি মনে আছে অন্য কারণে। জয়ের পর ভারতের অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় লর্ডস-এর প্রচলিত আদবকায়দা, তথাকথিত আভিজাত্যকে অগ্রাহ্য করে উর্দূ উন্মোচিত করে জামা মাথার উপর বন বন করে ঘুরিয়েছিলেন। শুধু ক্রিকেট নয়, শ্বেতাঙ্গদের প্রতি নতুন যুগের ভারতীয়দের ডোন্ট কেয়ার মানসিকতার এক অভূতপূর্ব প্রদর্শনী ছিল সেই মুহূর্তটি।

অনেক রক্ষণশীল ক্রিকেটানুরাগী অবশ্য কাজটিকে সমর্থন করেন নি। তাঁদের বক্তব্য, এই অভব্যতায় ক্রিকেটের কৌলিন্য কলুষিত হয়েছে। এই বৈপ্লবিক কাণ্ডটার বহু বছর পরে গাঙ্গুলি আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু কথা বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে। ব্যাপারটি ছিল নাকি ইংলন্ডের এক অসভ্য খেলোয়াড় ফ্লিন্টফের কিছুদিন পূর্বে ভারতের মাটিতে একই ধরনের জয়োল্লাসের বদলা।

সাধে কি সৌরভকে ‘দাদা’ বলা হয়!



রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৪, স্থান: সিডনি।

বহরখানেক আগে অল্প কয়েক ঘর বাঙালি নিয়ে ক্যানবেরা বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়াও আগের চেয়ে অনেক বেশী লড়াই। নিজের দেশে অস্ট্রেলিয়া বরাবরই অপরায়ে। তার ওপর সেই সময় দলটি তারকা খচিত – হেডেন, ল্যাংগার, মার্ক ওয়, স্টিভ ওয়, মার্টিন, ম্যাকগ্ৰা, ওয়ার্ন, গিলক্রিস্ট – এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

এ হেন দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের পর ফল ১-১। সিডনিতে চতুর্থ ও শেষ টেস্টের উত্তেজনা তাই তুঙ্গে। সেটি আবার অধিনায়ক স্টিভ ওয়-র ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। ক্যানবেরা থেকে সিডনির দূরত্ব তিন ঘন্টার। আমাদের নবগঠিত অ্যাসোসিয়েশনের জন্য পঁচিশেক বিভিন্ন বয়সের মানুষ একটা মিনি বাস ভাড়া করে দলবেঁধে চলেছি চতুর্থ দিনের খেলা দেখতে। ভোরবেলা শহর কেন্দ্রে গাড়ি রেখে ছল্লোড় করতে করতে চলেছি সিডনি।

সেদিন ছিল রবিবার। মাঠ একদম ভর্তি। আমাদের উৎফুল্ল থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথম দুদিন ভারত টানা ব্যাট করেছে – তৃতীয় দিন শুরু করেছে ৬৫০/৫, তেডুলকর অপরাজিত ২২০। ভারত অল্পক্ষণ ব্যাট করে ডিক্লেয়ার করে – ৭০৫/৭ (তেডুলকর অপরাজিত ২৪১)। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এখনো পর্যন্ত কোন সফরকারী দলের সর্বাধিক স্কোর। সেদিক দিয়ে আমরা এক ঐতিহাসিক দিনের স্বাক্ষী! গভীর রাতে হৈ হৈ করতে করতে ক্যানবেরা ফিরেছিলাম অস্ট্রেলিয়ার ফলো-অনের সম্ভাবনার আশা নিয়ে। সদর্পে আমরা ভারতের পতাকা উড়িয়েছিলাম সেদিন সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। জনাকয়েক পানোনাও অজি-র সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রমও হয়েছিল! পরের দুদিন অফিসে কাজে মন ছিলনা – ঘন ঘন কম্পিউটারে স্কোর দেখেছি। সৌরভ অবশ্য ফলো অন করান নি। ম্যাচটা প্রায় হারতে হারতে মূলতঃ স্টিভ ওয়-র নায়কোচিত প্রতিরোধে অস্ট্রেলিয়া বেঁচে যায়। টেস্ট খেলা আগে পরে অনেক দেখেছি – কিন্তু ঐ দিনটা আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন।

\*\*\*\*\*

এই লেখা পড়ে অনেকে – বিশেষ করে যাঁদের ক্রিকেট খেলায় সেরকম উৎসাহ নেই – ভাবতেই পারেন, এ তো বেশীটাই আশ্চর্য। অস্বীকার করব না। তবে আশ্চর্য সমর্থনে কিছু যুক্তি দেব। জীবনের দিন যায় আসে, বেশীরভাগ দিনের কথাই আলাদা করে মনে থাকে না, যদি না বিশেষ কোন ঘটনা বা স্মৃতি জড়িত থাকে। ক্রিকেটপ্রেমী হয়েও অধিকাংশ খেলার কথাই দিনকয়েক বাদেই ভুলে যাই। বিশেষ করে আজকাল বিভিন্ন ফর্ম্যাটে এত খেলা হয় যে আর তাল রাখতে পারি না। কিন্তু উপরোক্ত দিনগুলির কথা আজ তিরিশ চল্লিশ বছর পরও মনে আছে। আমার মতে কারণটা স্রেফ নস্ট্যালজিয়া নয় – দিনগুলি সত্যিই ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের এক একটি মাইলফলক বা টার্নিং পয়েন্ট।

খেলাগুলির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ইন্টারনেটে সহজেই পাওয়া যাবে। প্রতিটি খেলা ঘিরেই নানা গল্প আছে – কিছু মাঠের মধ্যে, কিছু মাঠের বাইরে। এই নেপথ্য কাহিনীগুলি নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনায় ভরা। এ লেখায় শুধু নাটকের মুখ্য অংশগুলির উল্লেখ করলাম মাত্র, ইন্টারনেটে সংরক্ষিত ভিডিও এবং সম্পৃক্ত নিবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে অনেক বেশী রোমাঞ্চকর লাগবে ক্রিকেট প্রিয় পাঠকের।



**সিদ্ধার্থ দে** – আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপারি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ – ফেসবুকে, ওয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে।

আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা [desidd.wordpress.com](http://desidd.wordpress.com) সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

## স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

### পূজা পরিক্রমা

“বাবা, একটা ব্যান্ড এড কিনে দাও।”

– গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে একটু গেলেই দর্পনারায়ণ স্ট্রীট। কানে এলো কথাটা। দুর্গা পুজোয় ঠাকুর দেখার লাইনে বোধ হয় সবচেয়ে পুরোনো কথা। বাঁশের ব্যারিকেডটা শুরু হয়ে গেল। বাবা অসহায়। লাইন ছেড়ে বেরোবে কি না ভাবছে। স্ত্রী কন্যা একটু এগিয়ে গেছে। কলকাতা পুলিশ খুব সক্রিয় ভূমিকায়। মাইকে ভেসে আসছে সকলের কি ভাবে প্রতিমা দর্শন করা উচিত, কিশোর কুমারের আশা ছিল ভালোবাসা ছিল গানটিও ভেসে এলো। পুজোর কিছু সময় আগেই তিতলির দাপট আজ ষষ্ঠীর রাতে প্রজাপতির দাপটে বিন্দুমাত্র থাবা বসাতে পারে নি। পুজোর উদ্বোধন তো সেই কবেই হয়ে গেছে। মানুষের ভিড়ও সেই সময় থেকেই। আসলে শরতের হিম, কাশফুলের মাথা দোলানো, মিঠে রোদুর আর ক্ষণিকের মেঘ, এই সবগুলোই যেন পুজো শুরু করে দেয়।

আর ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে তো সেই মহালয়াতেই।

সেই পরিবারটি ভিড়ে হারিয়ে গেছে। আলোর মালা, চেনা জায়গাটাকে একটা অন্য মায়ায় নিয়ে গেছে। বিশাল জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে পুজো নয় উৎসব আর উন্মাদনাটা গায়ে মেখে এগিয়ে যেতে থাকলাম। উত্তর কলকাতা দিয়েই শুরু করেছি। এখনো পুরোনো কলকাতা, তার সবটা মুছে ফেলেনি, বাড়ীর গায়ে লাগোয়া রকগুলোকে এই অনেক আলোর মালায় একটু অন্ধকার লাগছে।

পায়ে পায়ে মণ্ডপ, ভিড়, আলোয় উজ্জ্বল সচকিত নিজস্বীর বলকানিতে।

পাথুরিয়াঘাটার মণ্ডপ পেরিয়ে আহিরীটোলা। পুজোর সনাতন রূপ ধরা পড়ে বারবার। মণ্ডপ সজ্জা থেকে প্রতিমার মুখ, বাবার হাত ধরে উত্তরের দিকেই আসতাম। তখনো দক্ষিণ সেইভাবে উত্তরের ঘাড়ে উঠে আসেনি। পুজোর রঙে ভরা ষষ্ঠী মাতোয়ারা। আমি বেনিয়াটোলা, জগৎ মুখের্জী পার্ক পেরিয়ে কুমারটুলি। দুটো পুজো। একটা পার্ক আর একটা সার্বজনীন। কলকাতা বা কলকাতা ছাড়িয়ে নানা প্রান্তে এমন কি বিদেশেও প্রায় ৯৫ শতাংশ প্রতিমার উৎসস্থল কুমারটুলি। পাল বংশের কারিগরি মহিমা এখানেও বিকশিত। একটু ফাঁক পেয়ে সেই পরিবার টিকে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করা হলো না পায়ের কি অবস্থা। এবার বাগবাজার সার্বজনীন হয়ে শ্যামবাজারের রাস্তা ধরবো ঠিক করলাম। প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাসটা বেশ কাজে লাগছে। বাগবাজার, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মানুষের শ্রোত, মন ভরে চোখ ভরে সবটা পেতে চাইলেও উপায় নেই। ঢেউ, হ্যাঁ মানুষের ঢেউ উপচে পড়ছে। প্রবেশ করে কখন যে বাহির পথ ধরে ফেলেছি... ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত



আহিরীটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব



বাগবাজার



১ টা ২৫। টালা হয়ে শ্যামবাজার। সেই কখন খাওয়া হয়েছে, শরীর জানান দিচ্ছে তারও দানাপানি দরকার। ঢুকে পড়লাম নবকলেবরের গোলবাড়ীতে। কষা মাংস বেশ কষা হয়েই এল সামনে। জানিনা জিভের দোষ কি না। কিন্তু মনে হল পুরোনো স্বাদ টাই বেশি ভাল ছিল। ঠান্ডা পানীয়র বোতল হাতে নিয়ে শিকদার বাগান পেরিয়ে সোজা হাতিবাগান আর কাশিবোস লেনে। আলো মণ্ডপ প্রতিমা সবাই একে অপরকে করে তুলেছে অপূর্ব।

এরপর খান্না আর উল্টোডাঙ্গা হয়ে লেক টাউন যাবার কথা ভাবলেও ঘড়ি আর শরীর দুটোই জানান দিলো এবার ফেরাই ভাল। উল্টোডাঙ্গা হয়ে সোজা বাড়ি। ঘড়িতে তখন ৪ টে ৪৫।

ঘুম ভাঙতে দেরী হলো বেশ। পুজোর আজ দ্বিতীয় দিন। প্রকৃতিও যেন পাল্লা দিয়ে হেসে উঠেছে। বেশি রাতের কষা মাংস শরীরে আলগা একটা ভরবেগ সৃষ্টি করতে চাইছে। যাই হোক সারাদিনটা পূজাবার্ষিকীতে আটকে থাকার পর সন্ধ্যা নামতেই বেরিয়ে পড়লাম। গত দিনের অধুরা কাজ, সোজা রওয়ানা দিলাম লেক টাউন। মা দুর্গার আগমনী, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিল্পপতি সকলেই উদার হস্ত। রূপোর রথ থেকে সোনার মুকুট, মার ঐশ্বর্যে কোন কমতি নেই। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব থেকেই শুরু করলাম। লেক টাউন অধিবাসী, লেক টাউন নেতাজি স্পোর্টিং, দমদম পার্ক, ভারত চক্র, দমদম পার্ক যুবক বৃন্দ, তরুনদল। সপ্তমীর প্রতিমা দর্শনের ভিড় তখন সপ্তম পর্যায়। নাকে এলো অনেক পুরোনো সময় মনে করিয়ে দেওয়া আলুরদমের গন্ধ, বাড়িতে যা কোনদিনই তৈরী হতে পারেনি। গত রাতের কথা মাথায় রেখেই হাতের জলের বোতল থেকে একটু জল খেলাম। মণ্ডপ আর প্রতিমার বর্ণনা লেখার ভাষায় আনা প্রায় অসম্ভব। তাই হাতের ক্যামেরাতে বন্দী করে রাখা যতটা পারা যায়। কিন্তু মন আর চোখের তৃষ্ণা মিটেতেই চায় না। তাই বিবেকানন্দ পার্ক, সিমলা ব্যায়াম সমিতির মণ্ডপ ঘুরে চলে এলাম মহম্মদ আলি পার্ক আর কলেজ স্কোয়ার। শাড়ির মেলায় আজ যেন ষোলো থেকে ষাট, আঠেরো থেকে আশি মিশে গেছে। বেশ কিছু মণ্ডপের পক্ষ থেকে এইবার বয়স্ক আর প্রতিবন্ধকতার সাথে যুদ্ধে নামা সমস্ত মানুষদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তবু এক লহমায় মন খারাপটা ছুঁয়ে গেল। মা এর উৎসব, আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সপ্তমীর রাত গভীর, গানে, গল্পে, উৎসবে, সাজে, শরীরে। ফিরতে হবে, উত্তর শেষ করলাম সন্তোষ মিত্র



লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ



দমদম পার্ক তরুন সংঘ



মহম্মদ আলি পার্ক দুর্গাপূজা



মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপতি দুর্গাপূজা





তেলেঙ্গানা সর্বজনীন দুর্গোৎসব



নলীন সরকার স্ট্রীট সর্বজনীন দুর্গোৎসব

স্কোয়ারে। ক্লান্ত রাত পাহারাদার, পথের ধারের দোকানগুলো ঝাঁপ ফেলছে, সূর্য বাবাজীবন উঁকি মারার চেষ্টায় আলোর ঝাঁক সরিয়ে। আমার গাড়ীটা তখন দ্বিতীয় হুগলী সেতু অতিক্রম করছে, অষ্টমীর অঞ্জলি সকাল সকাল।

অষ্টমীর সকাল আগেই হয়ে গেছিল। রাত জাগা চোখেই দ্বিতীয় বারের ব্যাচ, ফুল ছুড়ে দক্ষিণা দিয়ে বাড়ী এসে লুচি, আলু ফুলকপি, বেগুন ভাজা, আর ছেড়ে দিলেও আজ একটু মিষ্টি। মাথায় জল পড়ার পরই বেশ বুঝতে পারছিলাম বিছানা টানছে, এবার তো উদর পূর্তি। মাইক, ঢাক নিমেষে হারিয়ে গেল। আমি অন্য লোকে। বেলা তিনটে, ঘুম ভাঙলো, দুপুরে আর কিছু খেতে ইচ্ছে হলো না, তাই পাশ ফিরে শুলাম। তবে ঠিক সাড়ে চারটে, আমি তৈরী। নেতাজী ভবন মেট্রো স্টেশন থেকে ভবানীপুর সার্বজনীন ভিড় কাটিয়ে সোজা ম্যাডক্স স্কোয়ারে। কেউ কেউ বলে মেড অক্স। এ এক আজব জায়গা। প্রতিমা বা মণ্ডপ নয়, শুধু গল্প আড্ডা ছবি তোলা খাওয়া। নানান জায়গার নারী পুরুষ। সকলেই নতুন পোশাকের গন্ধ নিয়ে আড্ডার মেজাজে। নিজেকে নিয়ে একটু অপ্রস্তুত হবো হবো ভাবতেই চোখে পড়লো কিছু অনাহারি মুখ, চোখ। পেটে তখন ও লুচি কপির জায়গা করে নিতে পারে নি। ভিড় এড়িয়ে ওদের সাথে কয়েক পা হাঁটার পর মনটা ভাল হয়ে গেল, পেটটাও অনেক হালকা, দূরের ভিড়টা হৈ হৈ করে কানে আসছে। এগিয়ে গেলাম রাসবিহারীর দিকে। বাদমতলা আষাঢ় সংঘ, ৬৬ পল্লী, চেতলা অগ্রণী। প্রতিমা সনাতনী মূর্তি হারিয়েছেন। বিভিন্ন শিল্পীর চোখে মা নানা ভাবে মূর্ত। তাল মিলিয়ে মণ্ডপ সজ্জা। রাসবিহারীর দিকে আবার ফিরে যেতে যেতেই রাত কাবার হবার উপক্রম। মানুষ যদিও অষ্টমীতে কিস্তি কম ভিড় করেছে তবুও দীর্ঘ লাইন যেন শেষই হয় না। পথ চলারও কোন বিরাম নেই তাই। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মুদিয়ালি আর শিবমন্দির শেষ করতেই ২ টো বেজে গেল। আজ ক্লাস্তিটা বেশিই। তাই ফিরে যাওয়ার স্থির করলাম।

নবমী নিশি, ঘুম আজ নিষিদ্ধ, নিশাচর মানুষের ঢল নেমেছে। অদ্যই শেষ রজনী। যদিও পুজো বা বলা ভাল উৎসব এখন এক্সটেন্ডেড হতে হতে লেজ আর মুড়ো দুই জায়গাতেই বেশ বড়সড়ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। একটু বিকেল বিকেল সোজা লেকের পাশে গিয়ে গাড়ী পার্ক। পাশের রাস্তা ধরে একে একে এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। বালিগঞ্জ কালচার, ত্রিধারা, দেশপ্রিয় পার্ক, সিংহী পার্ক, একডালিয়া, ফালগুণী সংঘ, বালিগঞ্জ ২১শের পল্লী। চোখ ধাঁধানো সাজ, অপূর্ব



বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন



ত্রিধারা সম্মিলনী





হিন্দুস্তান পার্ক



যোধপুর পার্ক



হিন্দুস্তান ক্লাব



সিংঘী পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব



বাবুবাগান ক্লাব সর্বজনীন দুর্গোৎসব



সমাজ সেবী সংঘ

আলোক সজ্জা, অন্য ধারার প্রতিমা, ঝাড় বাতির চমক, শাড়ী, পালাজো, মিনি, অফ সোল্ডার, টি শার্ট, জিন্স, এমন কি ধুতি পাঞ্জাবী, মুখ বেঁকিয়ে নিজস্বী, ফুচকার জলে নাকাল, রোল, চাউমিন, রেস্টোরার লম্বা লাইন, সংসারী লোক গলদঘর্ম, পুরোনো প্রেমিকদের হালকা ঝগড়া, নতুনদের হাত ছাড়াবে কার সাধ্য, বুড়ির চুল আর তালপাতার ভেঁপু, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব যেন প্রাণ প্রাচুর্যর সব উপাদানে হাজির। সোজা কসবা। বোসপুকুর শিতলামন্দির, তালতলাকে ছুঁয়ে গাড়িয়াহাট। একটু এধার ওধার পাশ কাটিয়ে রাত যখন ১১টা ছুঁই ছুঁই শরীরকে কষ্ট না দিয়ে ইচ্ছেলিয়া। উদর পূর্তি। এবার গোলপার্ক অভিমুখে হাঁটা। বাবুবাগান, সেলিমপুর, ৯৫পল্লী। দক্ষিণ অভিযান প্রায় শেষ। কিন্তু মনে পড়ে গেল আদি বালিগঞ্জ এর কথা। বাঙালি, তায় ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের ক্যাপটেন, সৌরভ গাঙ্গুলী তো আইকন। এখানে হাজির ছিলেন। এক অনন্য রূপটান পাওয়া। ঘুরে এসে পড়লাম টালিগঞ্জ মোড়ে। অজয় সংহতি, বরিশা ক্লাব আর বেহালা ফ্রেন্ডসকে হাত বুলিয়ে খিদিরপুর যখন পৌঁছলাম তখন শেষ রাত। যুবক সংঘ আর কবিতীর্থ। অনেক নতুনের মাঝে হারিয়ে যাওয়া দুটি নাম। আজও এসে পড়ি। গাড়ি নিয়ে ফিরে চলেছি। কি খেয়াল হতে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর মাঝে দাঁড় করলাম। দরজা খুলে গিয়ে



মুদিয়ালী ক্লাব



সুরঙ্গী সংঘ

দাঁড়ালাম রেলিং এর পাশে। সামনে নাঃ বেশ নীচে ক্রমশ নাব্যতা হারানো গঙ্গা বয়ে চলেছে। বয়সের ভারে নুবজ্য। নিজেকে তৈরী করেছে বহু কাঠামো আর রাসায়নিকের ভার বইবার জন্য। ভোর হচ্ছে। এইভাবে অনেকদিন ভোর দেখিনি। দুই পাশে বহু ইমারত আকাশ ছুঁতে চাইছে। উৎসবের বাজনা বেজেই চলেছে। এই ভোরবেলাতেই ব্রিজের পায়ে হাঁটা রাস্তায় কাঁধে বস্তা নিয়ে ফেলে দেওয়া জিনিস আর আধখাওয়া বিরিয়ানির প্যাকেট হাতে এগিয়ে যাওয়া। মা এর আরাধনার জাঁক জমক, মণ্ডপে মণ্ডপে বস্ত্রদান, আরতি, ঢাক, অনেক উঁচু ইমারতের ব্যালকনিতে দাঁড়ানো কারুর মুখ খুঁজতে চাওয়া মুখের ভিড়, সূর্যের রং বদলে ভোরের হিমকে গলিয়ে দেওয়া, আজ বিজয়া, সমস্বরে আওয়াজ আবার এসো মা। গাড়িতে বসে এফএমটা অন করতেই গানটা বেজে উঠলো আজ জানে কি জিদ মত করো.....





## সেতুবন্ধন, অক্টোবর '১৮

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব  
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।

ঠিক কার স্পর্শে তা বলতে পারব না, তবে বাংলা সাহিত্যের আকাশে তারা অর্থাৎ নক্ষত্র সমাবেশের ধারাবাহিক ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ-সুকান্ত থেকে সুভাষ-শক্তি-সুনীল-শঙ্খ এবং তার পরের প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে এই নিরবিচ্ছিন্ন এবং দীর্ঘ ছায়াপথ।

তবে বহুক্ষেত্রেই সমকালে চিহ্নিত করা যায় না এইসব সম্ভাব্য জ্যোতিষ্কদের। কখনো তা সাগরময় ঘোষের মত জহুরীর অভাবে, কখনো বা প্রচারমাধ্যমের নিয়নবৃত্তের বাইরে থাকার জন্য। অথচ বাংলা সাহিত্যের এই তীর্থভূমিতে নিরন্তর সৃষ্টি হয়ে চলেছে কিছু অসাধারণ সাহিত্য, আবির্ভাব হচ্ছে বহু শক্তিশালী লেখকের।

তাই সেইসমস্ত নতুন নতুন সৃষ্টির সঙ্গে প্রবাসী পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য শুরু হল বাতায়নের “সেতুবন্ধন”।

বিভাগটির দ্বায়িত্বে আছেন মানস ঘোষ (বাতায়ন / কোলকাতা)।

আপনাদের মতামত বা নতুন বই পড়ে পাঠপ্রতিক্রিয়া/সংশ্লিষ্ট পরিচয় পাঠানোর অনুরোধ রইল, নিচের ঠিকানায় –  
mailto:manas2014@gmail.com

### পরিচয় – ১

রাই কথা

মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক – চতুরঙ্গ (কোলকাতা)

চিঠিতে চিঠিতে নির্মিত হয়েছে এক কাহিনী। কাহিনীর গভীরে নেমে গেছে সিঁড়ি। তার শেষ প্রান্তে দরজা, সেই দরজা খুললে কখনো যমুনার তীর কখনো ধর্মতলার মোড়, কাহিনীর ভেতর আরো এক কাহিনী।

পরতে পরতে জাদু বাস্তবতার ছোঁয়ায় এক সাহসী বিনির্মাণ। সাহসী এবং এবং নতুন। উচ্চকিত ঢঙ্কানিনাদ নয়। মৃদু ও টানা কাব্যিক কোলাজের ভেলাটিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নতুনতর নিরীক্ষার বুকজলে, বিবিধভাষা প্রকরণ ও শব্দ পরিক্রমার সহায়তায়। কাব্যধর্মী গদ্য, পদ্য, চিঠিতে, তার যাবতীয় প্রেমের আকুলতা, বিরহের হতাশ নিয়ে বারবার উদ্ভাসিতা হয়েছেন রাই, – জাদু বাস্তবতার ছটায়, নানা সময়কাল আর সামাজিক প্রেক্ষিতে এই রাই যেন সমস্ত প্রেমিকা, সমস্ত নারীর এক বহুবর্ণা রূপ। বৈষ্ণব পদ, রাঢ় বাংলা থেকে হালের নাগরিক ভাষা, সবেতেই সে সমান স্বচ্ছন্দ। রাধিকার কৃষ্ণ কখনো ফকির, কখনো ইন্দ্রাযুধ, কখনো আকাশপুরুষ, আবার কখনো বা মেলায় মেলায় বাঁশি ফেরি করা দুঃস্থ কেঁট দাস।

ঋদ্ধ পাঠকের জন্য এ বই পাঠের অভিজ্ঞতা মনোমুগ্ধকর। তাঁরাই বিচার করবেন, এই নতুন নিরীক্ষা, অনবদ্য ভাষাশৈলী কি বয়ে আনতে পারবে এক উত্তরণের আভাস?

## পরিচয় - ২

অনুগল্প সংগ্রহ - স্বপ্নময় চক্রবর্তী

অভিযান পাবলিশার্স।

বিন্দুতে সিদ্ধ দর্শন বোধহয় একেই বলে। অনুগল্পের ছোট্ট পরিসরের মধ্যে থেকে যেভাবে বারবার সমকালের সমস্যা, স্বচ্ছ দর্শন বা সম্পর্কের নানা সুক্ষ্ম দিকের ওপর আলো ফেলা হয়েছে, তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

প্রায় শতাব্দিক অনুগল্প নিয়ে এই সংকলন, চারটি পর্বে বিন্যস্ত। গল্প বলার সহজ শৈলী পাঠককে টেনে ধরে রাখে, আর গল্পের শেষে যেন একটা ঢেউ এসে লাগে, একটা ধাক্কা এসে নাড়িয়ে দিয়ে যায় পাঠককে। ভাবতে বাধ্য করে, মোচড় দিয়ে যায় হৃদয় ও মস্তিষ্কের সুক্ষ্ম তন্ত্রীগুলোয়।

যখন মারণরোগে আক্রান্ত অন্ধ অতুলবাবু বলেন - “তোমার চোখে জল শ্যামলী, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি”, - একটা স্তব্ধ মুহূর্তের জন্ম হয়। গল্প শেষ হয়ে যায়, থেকে যায় অনুরণন। পড়তে পড়তে বারবারই এ অভিজ্ঞতা হবে। কখনো অবাস্তব রূপকের অসামান্য প্রয়োগে, কখনো নির্ভুর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে শক্তিশালী লেখক স্বপ্নময় সাহিত্যের এই নবীন ধারাটিকে একটা অন্য পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।





Jill Charles

## Frederick Douglass Never Gave Up on Voting

We wait in line to vote  
Hours and hours  
My friend says  
"It won't make any difference  
The government cheats  
City, state and federal  
They won't count our votes."

I think of all who gave me the vote  
And never lived to cast a ballot:  
Susan B. Anthony  
Sojourner Truth  
Frederick Douglass

Frederick Douglass never gave up  
Teaching himself to read  
Borrowed books by candlelight  
Escaping slavery in Baltimore  
In sailor clothes sewn by his bride  
Freedwoman Anna Murray

Frederick Douglass said  
"Right is of no sex  
Truth is of no color"  
We all have the right to freedom  
And responsibility to govern.

We wait hours to vote  
Some waited lifetimes.

Remember the homeless man on the church steps  
Think about immigrant families hiding  
Think about when the wrong man is arrested  
Remember those who cannot wait in line  
For the ballot and the voting booth

I cannot walk away.  
"We are making a change," I say.





M. C. Rydel

**The Haunted Villanelle**

I've seen his ghostly face in my window  
From the street below; his eyes shine heaven's light,  
Proving that we all go somewhere after we die.

Drawers open and close; flowers wilt and revive;  
The lights flicker; and I've never been more sure that  
I've seen his ghostly face in my window.

On the street below, people always say something  
About the wind, the music, the voices out of nowhere,  
Proving that we all go somewhere after we die.

In the sky above, the sun's a huge red ball,  
And the crickets and cicadas are silent, since  
I've seen his ghostly face in my window

Is he up there, haunting my pied-a-terre,  
Or just a desperate delusion invented for  
Proving that we all go somewhere after we die?

I've conjured up Virgil from Limbo, Judas from Hell,  
Politicians from Purgatory; and Angels from Heaven, who prove  
I've seen his ghostly face in my window.

He haunts me everywhere and all the time,  
Chasing me into the very lines of this poem, where:  
I've seen his ghostly face in my window  
Proving that we all go somewhere after we die.



## Mousumi Banerjee

### Still

First went the words  
Dropped here and there  
Like the orange leaves  
On a crisp Fall afternoon.

Then names  
Who was the chap  
That brought newspaper  
On Sunday mornings?  
Name of the little village on the mountains  
With white-washed churches,  
One hundred and two people,  
And two hundred and one sheep?  
And the math teacher  
Who taught limit going to infinity?

All of a sudden  
Lapses in a melody,  
A cherry missing from a cherry flan recipe,  
Almost like a lost beat.  
And blurry unfamiliar faces  
Eating dinner at the same table.

I am falling into oblivion within myself  
Where words fail  
And silence speaks.....



Binita Gupta

Sincerely

Dear God,  
I think I saw You yesterday.  
In my classroom wearing a tie,  
Hair speckled with bits of gray.

But dear God,  
I thought I saw You last week.  
Ten-armed, red-lipped, unflawed,  
Black waves shrouded in mystique.

God, I thought You had told me  
That "Plagues come from deception and sin" — —  
But today You just said, "It's easy — —  
Anything is preventable with vaccination."

When the universe was born and it first saw light,  
*Aum* was the first sound the universe sang.  
But now, that doesn't seem to be quite right —  
You just now said it began with a big *bang!*

I am surrounded now by a hundred new preachers.  
Forgive me, Father, for I am getting confused  
Do You take the forms of these teachers  
Just to keep Yourself amused?

I'm not quite sure who I'm supposed to believe,  
By day, You're Jekyll and by evening, You're Hyde.  
Maybe I'm stupid, young, or just naïve,  
But could You please just tell me which one of You lied ?

Sincerely, Your Devotee



## Susim Munshi

### Yes I Am

But I am Made in Bengal  
Like Made in India  
Or Made in Bangladesh  
Like the 100% cotton shirts  
Made in that multistory  
Shirt factory that came tumbling down  
But I don't remember making a donation  
It is the World Cup Soccer I watch  
Cheer, cheer, cheer for my favorite Brazil  
While a despot, a fascist comes to power  
The favelas welcome a baby  
Whose birth is as sure as its death  
In the shifting squalor of squators  
While Neymar scores a goal again  
And I pay \$49 for a  
Premium subscription channel  
20% of India's diseases are water related  
For 1 Billion people safe water is scarce  
My Durga Puja contribution was \$180  
For Chicken malai curry  
And a overpriced Bollywood star  
But I am a Made in Kolkata of Bengal  
At St. Xavier's they turned away Chhatra Parishad  
I showed I cared, loved, understood  
The plight of the poor and oppressed  
Joined in 14K walk from Dharmatala to DumDum  
And donated blood at Mother Teresa's Nirmalya  
I challenge you all the Made in Bengal of Chicagoland  
My brothers and sisters  
Say "Yes We Are"  
Against bigotry, oppression and suppression  
No one will leave our shores or those of Bangladesh  
We will forego our festivities at Durga Puja 2019 and beyond  
Buy bottles of water, save the children from cholera, stop rape  
Embrace a Rohingya

---

"Forward to the *Essays from The Education of a Bengali Gentleman*" by Susim Munshi — The great Stoic teacher Epictetus stated we become philosophers when we examine our preconceived notions, ask questions about our emotions and even the words we use each day. The essays in this collection are an honest self-examination of Bengali sentiments, values, and beliefs as perceived by the author who while growing up in a traditional Bengali household learned to look at them from a different perspective while going to a Catholic School and College in India, then moving to America for the rest of his adult life."

---

Jerry Kaiser

Butterfly



**Jerry Kaiser** is a floral designer and artist. He is currently working as a human rights volunteer, resettling refugees in the Chicago area.



Daniel Staub Weinberg

I Heart Mir I Love Peace in Russian







Becky Laurent (Springfield, Illinois, USA)

## HOW DO I FIT IN?

*Even though I just sent you an email about getting some time to look at your magazine, I went ahead and opened it up. Wow! I was pleasantly surprised and impressed. What an enormous selection of input from so many people and places.*

*Within minutes I started to write. It wasn't a poem, it wasn't an essay and it wasn't a story. It was just my initial thoughts after looking at your magazine.*

After being introduced to Jill Charles at her engagement party to my nephew, we shared that we both liked to write and that she is part of a magazine called “Batayan”. I, of course, had no idea what she was talking about and what that word even meant. Being polite, I asked her to send me the link to the magazine not knowing at all what in the world it was. I thought I might be interested in sending in some of my work.

When I opened it up, I was even more confused. As I looked through the magazines poems, writings, photos etc., it came to me that I am so uninformed about things outside of my own personal world. What could I possibly contribute to such a magazine. I have my own stories, poems, funny items I share. But how could that fit into such a magazine as this. I felt very intimidated and sad at how little I knew about the world around me.

I consider myself an everyday American with an everyday American life, an everyday American family, everyday American problems, everyday American hopes and dreams, etc. Never in my everyday American existence had I ever given a thought to anything outside of my circle of life. Of course, I have seen the hardships others have in other countries, but that was on TV and I would think momentarily, how sad, then after the commercial I went back to what I was watching and going on about my day.

How thoughtless of me to think that my life was the only thing important in this world. How rude of me to think “those people” are different from me. I have always been a loving, caring, considerate person and have never been prejudice or at least I didn't think I was. Because I didn't try to understand, help, give, or learn, I guess in my own way maybe I didn't think my time should be wasted on something I knew nothing about. How selfish of me.

I was awakened with the beauty of the photos, the sadness, and hopes of others, and the love that we all share as I read through the magazine. I am now retired, a daughter, wife, sister, mother, grandmother, cousin, aunt, and friend. But I realize that is my whole world. As wonderful as it is, this magazine has opened so much more to me. I immediately sat down and started putting my feelings into words.



After the above critique of myself, I thought, wait a minute, I have a lot to offer. I have done so many things throughout my life. I have owned several businesses, I have been successful, I have been a failure, I am extremely creative in many ways. I have raised my family with all that it entails. I was a child who later in life learned about why I felt the way I did, why I did the things I did, and why I didn't do certain things. I realized how my parents' values were put upon me with no input of my own until I grew up, just as theirs was put upon them by their parents.

I then realized I would love to share my life experiences with those that would be interested in why we are so different yet so much alike. I think it would open my eyes and maybe some of yours as well. I hope that I will be welcome in the "Batayan" world.

---

Becky Laurent lives in Springfield, Illinois, USA.



## Lew Rosenbaum

### Who Shall Inherit The Earth? – Lew Rosenbaum

<https://chilaborarts.wordpress.com/2018/09/06/who-shall-inherit-the-earth-lew-rosenbaum/>

*[First of all: apologies for the reproductions here, which come from my “phone” at the exhibit and consequently have all the defects associated with that. Second, this exhibit has now left Chicago and will be opening at MoMA in New York in October, 2018; then at LACMA in Los Angeles in February, 2019. Do not miss this exhibit. Last, with gratitude for having had the opportunity to meet Frances Barrett White, and her two children Jessica and Ian, and be welcomed into her home in the mid 1980s. — LR]*

“Think! Think about what you’re tryin’ to do to me.” These lyrics from the song written by Aretha Franklin’s (1968, *Aretha Now*) are chasing through my head as I mull over my response to seeing the Charles White Retrospective exhibit in the Art Institute of Chicago. *For the second time.* And I don’t go to exhibits more than once. But I did make time for this exhibit, and these Aretha-lyrics come to me because of something Danny Alexander wrote. It’s about the artist and the thought processes that galvanize the artist’s work, whether music to the ear or the visual music on paper and other media. It’s what the artist is *telling* the listener or viewer. I am not skilled in the language of visual art, so I will leave it to others to comment on the techniques, of which Charles White was a master. The force of the paintings, etchings, linocuts, drawings — everything — moved me to tears throughout the galleries. Often tears of joy at experiencing something that struck so close to home that it felt like a personal communication, an embrace by what art should be conveying.

Thinking. How do you capture brain waves on paper? The text accompanying “Awaken from the Unknown recalls White’s transformation after reading Alain Locke’s 1925 *The New Negro* anthology, and finding there “a new world of facts and ideas in diametric opposition to what was being taught in the classrooms and text-books as unquestionable truth.” Maybe you start there,



Awaken from the Unknown – Charles White (1961)



recalling what it was like, when your mother dropped you off at the public library (it was at the Chicago Cultural Center then) at 7 or 8 years old, and you reconstructed the real world from what you read there, and then walked the few blocks to the Art Institute, wandering the halls, where you said you found the work of Winslow Homer particularly influential. At least that's what Charles White did and said, and in this piece I see myself and imagine the subject of this piece on a road to discovery, perhaps after work, exhausted, and falling asleep over the piles of newspapers, just like I have done many times. Falling asleep in the process of awakening, kind of a visual pun, I suppose. She's been asleep and here is the key to awakening. Discovering the new ideas that transform. Here's a new idea that transforms: "Think! And let yourself be free!"

Much earlier in his life, Charles White contemplated what brought him to his own understanding. He painted these two pieces in 1942, "Hear This" and "This, My Brother."

Both these pieces speak to a kind of awakening, or different stages of awakening. Referring to the title of the novel by John Rood, call "This My Brother" *social consciousness*, the discovery not only that classes exist, but that the workers as a class, in this case the miners, have a class enemy. This form of learning comes directly from the struggle, the battles for a better life. It evolves out of what is often called the "spontaneous movement," though it should be clear that there is very little spontaneity even in this process. But then you have "Hear This," in which the two figures are engaged in, even fighting over, the written word. One figure, grasping a book, tries to convince the other about its point of view; the other, seems unconvinced (the text next to the paintings implies that it referred to White's own experience learning about the social struggle from communists). They (the man with the book, the communists) introduced something *new*, something that came from *outside the struggle* itself, something that reflected that *particular role that workers play in transforming society*. Changing the social order is fundamentally different from the practical role workers have in fighting for better wages and working conditions. Looking at these two pieces gives a kind of visual representation of the difference between the school of the strike struggle and the school of revolutionary propaganda. And, of course, the relation between the two: without the learning that comes from the practical struggle, the propaganda remains so much sectarian jargon. But in these two paintings, along with that dramatic "Awaken" piece,



This My Brother – Charles White (1942)



Hear This – Charles White (1942)



comes a visual lightning bolt that 100 pages of explanation can never transmit so dramatically (or, dare I say, graphically).

\* \* \* \* \*

Let's take a step backward, talk about Charles White and this "communism" thing. The text accompanying the exhibit alludes to it in a number of places aside from what is noted above. For example, at the entrance to the exhibit, the text calls him a "political leftist who championed the rights of the working class." The text accompanying his mural work reads: "White aligned himself with a group of leftist artists [in Chicago] who drew attention to inequities in American society in order to effect social change." It was much more than that. Frances Barrett White wrote a memoir of her life with Charles White (*Reaches of the Heart*, Barricade Books, 1994, o.p.). "Charlie's art teachers," she writes, "encouraged his talent and twice entered his work in statewide competitions. Both times he won, and both times when he appeared to receive the awards, they were denied to him." It was a mistake, he was told. Someone else had actually won. "By the time he was fifteen, Charlie had read . . . *The New Negro* many times. The knowledge of his culture he found there was overwhelming. . . ." He began to dislike school intensely, stopped attending, and found as an alternative the "Arts Crafts Guild, a group of black artists who met every Sunday. It changed the direction of his art." In his early meanderings in the Art Institute, he had been influenced by Winslow Homer and the Hudson River School, and this translated into paying attention to landscapes. Now, with the Arts Crafts Guild, he took his easel "into the neighborhoods and painted people. Black people. . . on the streets, on the stoops of broken-down buildings, and hanging up their laundry." Winning another statewide competition this time brought him a one-year scholarship to the Art Institute.

He completed his course work in 1938, a time when the depression still ravaged the streets of the U.S. The government found work for artists through the Works Progress Administration; numerous arts organizations brought writers and people in the theater and visual artists together to talk about their individual crafts and also how to address the issues raised by the depression. Along with the fight to survive came the attempt to grapple with the issues intellectually. Within this ferment communists brought their understanding of the drive toward World War that was seizing Europe. In the John Reed Clubs and later the American Writers Congress, authors debated how to stop the threatening war. Artists joined the Lincoln Brigade of the International Brigades to stop the fascist offensive in Spain. Artists looked to Mexico and the mural movement there and the involvement of artists in workers' struggles. The current exhibit mentions only four murals he worked on; but Fran White relates that he "joined the WPA where he painted murals in post offices, libraries, and public buildings throughout the country, never staying in one place any longer than the work required." In 1941 he married Elizabeth Catlett, a prominent Black sculptor, and in 1942 won a \$2,000 fellowship to study the role of the Negro in the development of America. The two of them spent the next two years in the American South studying and sketching subjects from Black life.

Drafted into the army in 1944, he suggested to his Sergeant that he could use his skills as a combat artist. He was therefore assigned to the Jefferson Barracks in Missouri, where "he painted the mess hall, the tables, the benches, and the chairs again and again, always using the same color of green paint." During a flood he and his fellow soldiers in the segregated battalion filled and moved sandbags, as if in a prison gang. And shortly thereafter he came down with tuberculosis, which affected him for the rest of his life.

These are some of the events that formed the context of his early life for the intellectual development that brought him, for example, to be an art director at Wo-Chi-Ca, or Workers' Children's Camp in upstate New York (where he first met Frances Barrett). Led him to form binding friendships with some of the most prominent artists of the time — Margaret Burroughs, Gordon Parks, and Rockwell Kent — and, when he settled in New York, to form an organization, the Committee for the Negro in the Arts, in the early 1950s, including Harry Belafonte, Sidney Poitier, Ossie Davis, Ruby Dee, Langston Hughes, and Oscar Hammerstein. He appealed to friends in the Thomas Jefferson School of Marxist Studies (the Communist Party workers' school) for help finding a place for an interracial couple to rent an apartment in New York. These cohorts, his colleagues, his confreres stoked that intellectual fire and helped him conclude, as the text to the exhibit proclaims, "Art is not for artists and connoisseurs alone. It should be for the people."

\* \* \* \* \*

Art isn't only to illuminate horrors of the past. It's to envision, to hope for the future. So yes there is "Birmingham Totem" printed after the 1963 bombing of the Birmingham church. And there is the series of "Wanted Posters" that summon up all the demons of past enslavement and degradation post slavery. About that group of works, done in 1969 to 1971, White said: "Some of my recent work has anger. I feel that at this point I have to make an emphatic statement about how I view the expression, the condition of this world and of my people . . . I guess it's sort of finding the way, my own kind of way, of making an indictment." But there is also the ecstatic "Oh Freedom," expansive joy in the face of the subject, with the vigorous open-handed casting of seeds (in my mind, the intellectual seeds falling on fertile soil of the oppressed).



Oh Freedom – Charles White (1956)

Look also at the determination in the eyes of the woman depicted in "Ye Shall Inherit the Earth." I dare you to think that this woman will allow her child to inherit an earth like the one into which we have been born. She has her eyes on the prize and will protect not only him, but all children. Of course the title is a reference to "Sermon on the Mount," but keep in mind that in 1953, when he drew this piece, he could not marry his wife in the state of Michigan; and that he could not easily find an apartment to rent in the city of New York. To live in this land was not his birthright, and to imagine it, well, that almost smacked of treason.

In "Hope for the Future" and in "The Children" White again turns to a rendering of the child as a symbol of what is possible. Where can we go from here, he seems to be asking, how can we extricate ourselves from this dilemma in which we find ourselves? It is certainly the same question revolutionaries ask themselves today, knowing that hope for our future lies with those recently



Ye Shall Inherit the Earth – Charles White (1953)



born. And, perhaps much like Charles White, here we stand trying to figure out how can we prepare for that future with the best possible art? The way Charles White does it, as revealed in this exhibit and these pieces in particular, is by showing that the best art is also the best propaganda, the best propaganda is the best art. How do you convey, with the necessary ambiguity to express the shifting ground on which you are standing? Look at the massy workers' hands — I don't know another way of describing the strength, the weight, the solidity of those hands — gently holding the child in "Hope for the Future." Is she looking off to the side, and if so what is she seeing?

Is she presenting us with a gift, this child, this future? Are "The Children" looking through the window with confidence, anticipation, hope . . . or is it with fear? Now that *we* see it, it is *ours* to do with what we will. It is *our* future now.

\* \* \* \* \*

I saw the show for the second time on the Thursday five days before the exhibit closed (Thursday nights are free at the AIC). It was much more crowded than the first time I went, and from the moment I entered I knew I was among a group of people who were there not simply to be seen at the latest big exhibit. These were folks who really engaged with the art, some who were, like me, old enough to be contemporary with some of his working years; others born long after he had passed on (he died at the young age of 61 in 1979). It was a conversation starting crowd, because of the excitement with the art and what it represented. Like when I first came into the exhibit hall and looked over the shoulders of three older people no longer looking at "The Cardplayers," but talking about what was life like in the 1940s during the war, and what did it mean to throw all the effort into the war, what did that mean for artists, and the older man, trying to remember, the word was right on the tip of his tongue, he couldn't quite find it, it had something to do with limited quantities of goods available in stores, and just then a younger man, standing next to me, interrupted to say the word, and they all said Yes! Rationing, that's it! And how do *you* know about rationing? And so the conversation continued with young and old appreciating each other and then talking about what they appreciated in the art work. And then they moved on, new friends made and



Hope For the Future – Charles White (1945)



The Children – Charles White – (1950)

exchanging views until, much later in the exhibit they shook hands, even embraced and bid each other good bye.

It was a conversation starting crowd. The secret smiles between two people as they saw the same things in the drawings. Yes this is my favorite in the whole show. I really like the “Wanted Posters”! I don’t know how he created this sense of motion with his pen and ink. And near the end, I found myself standing next to an older man, perhaps my age, who wondered why it had taken so long for a show like this to be mounted. He told the woman standing next to him, I don’t give the Art Institute credit really. They should have done it a long time ago. Of course I’m glad they did it now. You notice one thing about his work, he tells me, and that is the large hands and feet, the parts that engage in work. The emphasis on these, and his voice trails off. And then he begins to tell me, you know why there are so few oil paintings? It’s because oils are expensive, and he never had enough money to spend on oils. Well, maybe this is true. But I cannot get out of my mind Charles White’s own words, that art is not simply for the artist or the connoisseur but, most emphatically, for the people. And his work was displayed and copied and shared everywhere. Prints are a form adapted to this kind of art. Often people’s first exposure to a Charles White print was a poster on a telephone pole. “Ye Shall Inherit The Earth” was used as a poster to advertise a 1960 NAACP rally in Los Angeles.

It is disappointing that the mural — “Struggle for Liberation (Chaotic Stage of the Negro, Past and Present)” — Charles White designed for the Hall Branch of the Chicago Public Library was never installed. He began the mural in 1940, near the end of his WPA days and before he and Elizabeth Catlett went into the South to gather material for the Julius Rosenwald Fellowship. Striking out from the left panel of the mural is the insurrectionary John Brown, while more modern forms of protest form the core of the right panel. A color study for the mural showing both panels is in the show, and it gives some idea of his bold ideas. The exhibit also presents a study for the mural, “The Contribution of the Negro to Democracy in America,” the result of the Rosenwald Fund fellowship, and still installed at Hampton University in Virginia. The text for the exhibit identifies fourteen figures in the mural, including his contemporaries Marian Anderson, Paul Robeson, and Leadbelly. I listened in to the conversations around these murals, to the excited identification of the people in the murals, to the careful examination of the features of the black and white studies for the mural (Robeson and Denmark Vesey, for example).



Study for Struggle for Liberation  
(Chaotic Stage of the Negro, Past and  
Present – Charles White (1940)



Study for the Contribution of the Negro  
to Democracy in America –  
Charles White (1943)

Charles White grappled with the idea of how to introduce new ideas into widespread discourse all his life. Roque Dalton wrote that “Poetry, like bread, is for everyone.” Bertolt Brecht or maybe Vladimir Mayakovsky perhaps wrote, “Art is not a mirror held up to reality but a hammer with which to shape it”; Both certainly could have said this: it is congruent with their writing and their philosophy. There is no doubt that Charles White, along with these other titans, saw his pen and brush as his weapon: Art is, after all, not for the artist or the connoisseur but should be for the people.



Sreya Sarkar

## Lady in Red

"Aggarwal ji this is Monty. I will be there in fifteen minutes," Monty droned an apology to Mahesh over the phone for running late. After a couple of curt responses, Mahesh disconnected the call and shook his head in exasperation. His soon to be son-in-law Nitin had requested him to meet his friend Monty, an upcoming apparel designer, amidst the crazy preparations of his daughter's wedding. Mahesh's house was over flowing with relatives and his daughter's wedding festivities. So, he had agreed to meet Nitin's friend at a nearby hotel. He ordered himself a stiff whiskey at the lobby and ran his gold-ring laden fingers through his thinning hair.

Mahesh Aggarwal, the proud owner of *Reshamdor Sarees* was not used to waiting for anyone. He had built himself a successful business empire in the last two decades. His father had owned a small *saree* store in Burrabazar. He had left him, then a mere lad of twenty, to shoulder the responsibility of his failing business. Growing up with older sisters who discussed *sarees* every waking hour, Mahesh had developed a good eye for them from a tender age. When he married, his wife brought in a hefty dowry with her that helped him invest in a modest workshop to add threadwork and dyes to the *sarees*. It was not a smooth ride and he had to fight numerous battles to keep his expansion plans buoyant.

Mahesh's hawk-like eyes scanned the lobby and came to rest on an attractive looking woman. She was wearing a shiny red *saree*. Her slight slant of head, and the way she rested her face on her palm, gave her a distinguished poise. She seemed to be a proper lady, not one of those easily available, yet when their eyes met, she smiled at him for no good reason. He reminded himself that reputable men like him shouldn't smile back at unknown women, especially in hotels and forced himself to look away. His gaze travelled out of the hotel's broad windows and stilled on the hotel's rectangular swimming pool. It was raining hard against the concrete parapet, making the palm trees around the pool sway like lost souls in a wild trance. Mahesh remembered his boyhood, when he would often sneak out during rains and frolic in rainwater filled puddles. He would come back home drenched and his mother would chide him for his messy adventure. The rains always had an uplifting effect on his disposition. He finished his first drink and ordered a second one as his eyes travelled back to the lady in red. She looked young, probably in her twenties. He felt conscious about his own age and appearance. If only he was more distinguished looking, a bit taller, a tad broader. He sat up and straightened his shirt collar. In his younger days, he was a ladies' man but now with grown-up daughters, he was more cautious about his trysts.

Mahesh's cell chimed. "Daddy ji I am sorry Monty is late. He just called me a minute ago. There is a nasty traffic jam on the highway and it will take him another half hour to reach," said Nitin in an anxious voice.

"My whole evening is spoilt because of this friend of yours. I have so many things to do before your wedding and now..."

"I am sorry. I will understand if you choose to leave." Nitin sounded dreadfully apologetic.





Mahesh liked Nitin. He appreciated Nitin's sense of dedication towards his work for he had not allowed his upcoming wedding to consume his entire attention and slight his business acumen. Mahesh sensed that Monty was important to Nitin, for Nitin had just signed him up for his enterprise. He could not let his son-in-law down by being uncooperative. "I will wait some more. You better tell Monty that I am doing this just for you."

X X X X

The woman talked into her cell phone for a while, appearing rather restless. As she disconnected she walked to the lobby bar and ordered herself a drink. She sat down on the couch next to Mahesh's with a glass in her hand. It was filled with an amber colored liquid. She turned to face him and smiled tentatively. "It doesn't look like the rain is going to stop anytime soon." It took Mahesh a few seconds to realize that she was really talking to him. He blinked his eyes consciously. "Are you waiting for someone?"

"Yes, a friend of mine. He is trapped in a big traffic jam on the by-pass."

"The person I am waiting for might be trapped in the same traffic. You could talk to me until your friend arrives." *What am I getting myself into?* Mahesh shuddered inwardly at his sudden audacity.

"I don't want to disturb you," she said.

"You are not disturbing me at all. I...am Mahesh. May I know your name please?"

"My name is Reema." She sighed and continued, "I am not going to get a taxi back home easily tonight. If my friend does not show up it's going to be difficult reaching home."

"Don't worry, I can help you." The offer to help slipped out of him before he could check himself.

"Why will you help me? You don't even know me." She gave him a surprised stare.

"That can change. We can get to know one another." He had a hint of smile in his eyes that he couldn't resist. Her face went blank for a while but a moment later her eyes narrowed as she appraised Mahesh and he felt an absurd rush of adrenaline. They sat sipping their drinks measuring their thoughts and wordlessly, like strangers do. "Have we met before?" he asked. She did look familiar. She did not answer. Another brief silence followed, and Mahesh started to wonder if he had overstepped. Then she cleared her throat and said softly, "Can we go the rooftop café? It's much quieter there." Mahesh was thrilled at the unexpected directness. His heart galloped. "I have to meet someone. Can you wait for me?"

Reema's eyes sparkled as she thought for a moment. Then she finished her drink and stood up. "Sure. Do you like living on the edge?"

Mahesh was amazed at how the conversation was turning out. "Why not?"

"In that case, I have a little game planned for you. I hope you won't mind playing along." She walked away with a lilt in her steps. She looked elegant yet tempting, respectable yet bold, a strange mix of soft and hard. The alcohol was starting to buzz in Mahesh. He got up to wash his face in the washroom. He had just decided to meet a stranger at the rooftop café. This was beyond bizarre. He felt like he was stepping into a fast shifting time warp and losing his calm composed



older self to the younger reckless one. Monty called again and this time Mahesh spoke calmly, amused at the absurdity of the situation. "Just call me when you reach, and this time you might end up waiting for me."

X X X X X

Reema flashed a radiant smile when she saw Mahesh walking up to her at the Rooftop Café.

"Tell me, we have met before, haven't we?"

"Perhaps we have," she said in a low voice.

"You sound so mysterious. What do you really want from me?"

Reema narrowed her eyes. "Exactly what you want from me."

Mahesh felt a quick flow of blood to his face. He looked away to scan the almost empty café. His eyes hurt from the low lighting. His head was growing a dull throb.

"Come on, let's start the game I was telling you about. You tell me a secret about yourself and I will tell you one of mine. One by one we shed our layers," said Reema slowly, caressing each word with her full lips.

Mahesh craved the company of beautiful women. It was an addiction that he had guarded over the years, but it had a tendency of showing up surreptitiously, sneaking up on him unaware at the oddest moments. The only way he could get over the strong pangs was by indulging them once in a while.

"Well, I can share some secrets if you promise that you will not be offended," Mahesh said with open leer in his eyes.

"I am not that easily offended."

"Okay then. I love women, especially if they are as attractive as you."

Reema gave him a steely look. "I love drinking," she said.

"That's not much of a secret, is it?" chuckled Mahesh.

"I have another name that my father gave me but I don't use that always," said Reema.

"Hmmm...my father had asked me never to drink but I didn't listen to him," said Mahesh.

"I like dancing in the rain," said Reema.

"I have an empty flat in Kolkata that my family doesn't know about," said Mahesh.

"I love taking long relaxing bubble-baths," said Reema.

"I like going for long drives on nights like this," said Mahesh with a grin.

"I love expensive perfumes, it's my big weakness."

"I love expensive watches, my big weakness."

"We both have expensive weaknesses, don't we?" said Reema.



"Weaknesses are always expensive," said Mahesh his smile widening.

"I like older men," said Reema, her eyes burning into Mahesh's.

"I like risk-takers," said Mahesh.

"I like people who are direct, who can state what they want without flinching," said Reema.

"Same here," said Mahesh. It was heady flirting with someone like her, someone half his age.

*But where is this going?* he wondered, growing restless after sometime. Mahesh wanted more. Much more. He was sinking deeper and deeper into Reema's beautiful kohl-rimmed eyes and felt flattered by her attention. He found her brash, unnerving, but also exciting.

"I have a special talent," said Reema dreamily.

"What is that?" asked Mahesh swooning under her attention.

"I can read faces," said Reema.

"Really! Tell me what you see here."

"You run a very successful business."

"That is not very difficult to guess," Mahesh said teasingly.

"No, it is not," admitted Reema. "You are in the *saree* business, right?"

"That is correct."

"You worked hard to reach where you are." Mahesh let out a satisfied breath.

"You had to do a lot of things to get what you wanted. Some good. Some bad," said Reema.

"Don't we all have to sometimes do things we are not proud of?" said Mahesh, intrigued.

"Not the kind of things you have done," said Reema.

Mahesh felt uncomfortable about the way she said it. "You know what, I think you are taking this game a bit too seriously. Let's just relax and enjoy each other's company, okay?" Mahesh said.

She drawled unhurriedly, "Mahesh *ji*, I admire men who admit what they are capable of. That is also another secret I have just let you into. Let me tell you what I see. The great Mahesh Aggarwal, owner of a big *saree* empire. You have inspired a lot of young entrepreneurs. You grew your business quickly but ruthlessly, leaving a lot of people hurt."

Mahesh knew that he should stop Reema from talking further but he seemed bewitched at how she was looking at him.

"You had brought a group of skilled *Rabari* women from Rajasthan, to train your workers. You overworked them so much that two of the women fell ill during their stay and you refused to pay them their due wages. Your manager in those days was disturbed by this and requested you to reconsider how you treat your workers but you chose to... ignore him."

"The very next year you transported a group of *Chikankari* craftswomen from Lucknow and got even bolder with them. You demanded sexual favors just so that they got their full pays."





Beads of sweat lined Mahesh's face. His throat felt unusually scratchy. "Who are you?" he asked in a gravelly voice.

Reema continued without answering his question. "That is not the end of your heinous deeds. You knew that the chemicals used in your workshop emitted fumes that was a health hazard. Workers developed a bad cough and your manager asked you to look into the matter, but you did not do anything until one of them died."

Mahesh could feel hot blood whooshing in his ears. His manager Alok's face came to his dreams often, even after so many years. After the death of the worker at his workshop Alok wanted to resign.

Mahesh used to drink himself silly back in those days. He had got drunk and felt unreasonably furious with Alok. "You are a nobody. Don't you threaten me!"

"I am not threatening you Mahesh ji. I am just saying that your ways are very different from mine. So, it is better that I quit," Alok had said and resigned formally.

Mahesh had felt threatened for Alok knew too many of his dark secrets. His upright personality made Mahesh uncomfortable. He spent an entire night worrying about what Alok might tell others. A few light slaps and blows were all that he had asked his men to deliver just so that Alok would not open his mouth against Mahesh, but the goons had gone overboard. Alok had died just after a day in the hospital. Mahesh remembered visiting his family to offer help. Alok's wife was young. Suddenly he remembered her unique face and a shot of fear ran through his body. He stumbled out to the terrace. It had stopped raining but the air was still wet from the rain. *How is that possible? That was such a long time ago.*

Mahesh asked again in a quivering voice, "Who are you?"

"I am Alok's wife."

"But...but..." stammered Mahesh wide eyed. "I had heard that his wife had died a year or so after him..."

Reema's eyes had a queer shine in them. "You are right."

She set free a low menacing laugh. "That is my last secret."

His breathing began turning erratic and he felt a numbness spread through his arm. His words slurred. "I didn't want Alok to die, believe me..."

The wet wind whipped her hair wildly around her face. "But you did kill him." The wind started howling in his ears. Her piercing gaze squeezed Mahesh's breath out of his lungs. "I am going to... finish you." He tried to reach for her neck. "I am already gone." She took a step away from him. "But now it's your turn." She held out her slim hands that had looked so attractive a while ago. Now they seemed to grow towards him like a serpent, lethal and unforgiving.

"Come with me. It's time for you to leave as well." That was the last thing he heard before the whooshing sound took over his hearing and he lost consciousness.

X X X X X X

Monty watched his friend nervously. "What you did was dangerous Brishti!" Mahesh had



suffered a severe heart attack and was ordered bed rest for a month. Monty was afraid that he would harm Brishti if he found out about her. But Brishti did not care. The nightmares that had chased her for years, had finally stopped.

She was fifteen when her father, Alok, died because of Mahesh's callousness. Her mother died of a broken heart a year later. Bristi's grandparents had made her promise never to go near Mahesh but Brishti knew in her heart that she would not be able to move forward in her life until she avenged the untimely death of her parents. As she grew up she was the spitting image of her mother, but had none of her mother's softness. The pent-up anger had corroded her insides and made her hard. Fortunately, she made a few good friends in college who introduced her to theatre acting. Her theatre troupe became her close family and saved her from her bitter self. Brishti met Monty there. They acted in several productions together and became good friends. She opened up to his caring, empathetic temperament and told him about her painful past.

Monty transformed into a successful designer in a few years-time and bumped into Nitin, his old school-friend who wanted to commission him for his line of apparel. Monty learnt from Nitin that he was getting married to Mahesh's daughter. When Brishti found out about it, a plot crystallized in her mind. It took her a while to convince Monty to help her. He had been skeptical about luring Mahesh into a meeting through Nitin. "I will be hurting Nitin indirectly through this."

"No one will ever figure out that you could have any connection with my father," Brishti had convinced him. "You said Nitin is a good man. He will take care of that horrible man's family if there arises a need." Brishti had used her uncanny resemblance to her mother to teach Mahesh Aggarwal, a much-deserved lesson.

"What if Mahesh Aggarwal finds out about you once he recovers?" Monty asked, his eyebrows raised in concern. A crooked smile curled around Brishti's lips. "Don't worry, Mahesh ji will never have the courage to look for the *lady in red*, not even in his dreams now!"





## Film Reviews by Ranajoy Ganguly

### Gems from past and present

#### ***Ramdhanu (Bengali)***

**Director :** Shiboprosad Mukherjee and Nandita Roy.

**Cast :** Shiboprosad, Rachana Banerjee, Kharaj Mukherjee, Gargi Roychowdhury

I have always admired the creations of this duo director – Shiboprosad and Nandita, right from the days of “*Ichhe*” and “*Prakton*”. *Ramdhanu* delves deep into the psyche of the Bengalis that goes to any extreme to see their wards in an English medium school. The whole focus and mantra of the entire family gravitates around a single theme, how to teach English to the 6 year old son that deserves an education much better than the current schooling. Rituparna comes as a Godsend when her business of grooming parents to face interviews from schools where the wards are supposed to compete for a seat.

Climactic moment is when the mother realizes that it is the son’s well-being and his happiness that really supersedes all forms of education. This realization comes just after they understand the loneliness and helplessness of an elderly couple in their apartment complex, whose son is a big shot in NASA, but hardly has time to talk to his forlorn parents in India. The couple almost start picturing their future in this forlorn couple. The son finally cracks an interview, but would he really join the celebrity English medium school? A nice watch and like any other Shiboprosad-Nandini film, comes with a very direct, crisp message.

Stars : 4 out of 5

---

#### ***The little girl who lives down the lane (English)***

**Director :** Nicolas Gessner

**Cast :** Jodie Foster, Martin Sheen

A very old movie starring Jodie Foster as an early teenage girl of 14. Well, she was actually a 14 year old girl in 1976 when this film was shot. She is mysteriously living alone in a large mansion at the end of the street. Some local people, including the police get suspicious. On interrogating her, they come to know about her father being out of town. But is that the truth? What is it that she tried to hide. With a perfect poker face, with brilliantly and meticulously planned steps and measured dialogs she is almost invincible in front of seasoned interrogators and policemen. A real mind game that she keeps on playing till the end. But again, what is she hiding? Well, she has lots to hide at a tender age. Towards the end, you will empathize with the little girl, who albeit a heavy heart puts up such a strong face and carries on with her life unfettered. A superb movie that will keep you nail biting for the entire span. Jodie Foster’s brilliance was evident from that tender age and no wonder she went ahead to win many more laurels after earning her stripes in this film.

Stars : 5 out of 5.

---





### ***By the sea* (English)**

**Director : Angelina Jolie Pitt**

**Cast : Brad Pitt, Angelina Jolie**

Brad Pitt and Jolie give a riveting performance. This 2015 movie is an excellent portrayal of a marriage that has turned cold after 14 years. To spice up their marriage this rather odd couple start spying into the privacies of their next door neighbor in a hotel and even start enjoying the intimate moments of the couple. The deep and dark recesses of the wife's mind is explored, when a sense of jealousy takes the better of her. She starts seducing the husband of the neighbor only to be caught by her husband. The husband confronts her and helps her vent out all the negative feelings in a moment of mental catharsis.

An excellent movie.

Stars : 3.5 out of 5

Warning : Please don't watch with kids.

---

### ***Perfume (English & French)***

**Director : Tom Tykwer**

**Cast : Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman**

Jean-Baptiste Grenouille was born in eighteenth century France with a superhuman olfactory sense.

He was born in a fish market in a French village and was raised as an orphan. When the owner of a local perfume shop identifies his unique skill to discern different fragrances with infallible accuracy he employs him. Jean-Baptiste gets the training of preserving fragrances as his salary. Obsessed with the desire to capture and store fragrances, Jean-Baptiste starts his mission of capturing fragrances from bodies of women. He stores them successfully but at the cost of a lot of lives. Very soon, the murders that he had committed in his obsession to create makes him a most wanted criminal. He is arrested just after he succeeds in creating his "dream fragrance" that can extract the most amorous and carnal feelings from humans. Minutes before his execution, he lets loose a good amount of that fragrance and sets the entire crowd including the government authorities into a mass orgy. He walks out of his trial unscathed. However, the ending is a bit sad, after he returns to his place of birth. In short this is a master piece with a unique story line.

Stars : 4 out of 5

---

### ***I can Speak (Korean with sub-titles in English)***

**Director – Kim Hyun Suk**

**Actors – Na Moon-hee, Lee Je-hoon.**

*Goblin Granny* is a rebel in her community, and virtually a terror to the local municipal office with the myriad valid complaints and loopholes that she brings to the visibility of the officers. The officers' bureaucracy irks her and she makes no bones in creating scenes and insulting the officers

---



if required. However, very suspiciously she eyes on a young new joiner who speaks excellent English. She hounds and coaxes him on a desperate bid to learn English. But what is the genesis of this desperation. Goblin Granny has a very tormented past when she was subjugated in Japanese camps, which were nothing but chambers of torture and regular rapes. These camps used to operate in Korea under the garb of “comfort women’s” camps. The film has spots of melodrama when the protagonist and the young officer share moments of sentiments. Granny’s journey to USA and to Washington DC was packed in the film sequence rather hastily and could have been better elaborated since that was the central motive of the movie. Overall this is a pretty well made movie and deserves the viewers’ attention till the very end.

Stars – 4 out of 5

---

### ***Hichki (Hindi)***

**Director : Siddharth Malhotra**

**Cast : Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar**

After a hiatus of quite a few years, Rani comes back with an excellent performance in this partial adaptation of “Front of the Class” from Hollywood. There is this branded school for the elites that have a section in it which is filled with pupils from a nearby slum, as a result of some land deal. The kids of the slums are apparently delinquents or ruffians who bring alcohol and cigarettes to school, rough up the so called “rich” kids. Rani is in desperate need of a job to prove herself. She has a very rare condition (Tourette’s syndrome) which makes it impossible for her to talk without involuntary sounds and syllables that her brain can’t control. She faces ridicule from the delinquent class that is assigned to her. They make her life miserable because they want to get rid of her. However, not to be daunted by the pranks and arrogance of the slum kids, she goes above and beyond to instill interest in science in the kids. The kids start understanding that this teacher is no ordinary teacher and she is here for a mission, a mission to improve their lives and to prove that it is the “teaching” that can make a difference and not the students. Her unconventional methods face a lot of criticism and threat from higher management. But what happens in the end is spectacular. A must watch movie.

Stars : 4 out of 5

---

### ***Get Out (English)***

**Director : Jordan Peele**

**Cast : Daniel Kaluuya, Allison Williams**

A one of a kind movie. Simply brilliant with a concept that has perhaps never been ventured hitherto. There is this quaint little town where everyone is very polished and suave on the outside but there is something going on. A college girl takes her boyfriend to visit her parents over the weekend. The girl’s family is extremely courteous and well-mannered with the inter-racial relationship of their daughter. However, there are some shocking and unnatural behaviors of certain people in the town that makes the boy suspicious. On further delving, he senses that maybe he is part of a larger plan. In a gesture of warm welcome to the girl and her beau, the entire



town comes for a dinner. There is an auction that is covertly carried out, in sign languages with no words spoken. What are they auctioning for? A particular man gets enraged when someone clicks a photograph of his. What do the old folks in the town want to bid for? What secret are they guarding? Please watch this exceptional and horror cum sci-fi under the wrap of a run of the mill family movie. A shocking saga of slavery of the mind, when the body is left free.

Stars : 4.5 out of 5

---

### ***Fences (English)***

This one is an adaptation of the 1985 Broadway play named "Fences"

**Director : Denzel Washington.**

**Cast : Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson.**

This film is set in the era just after the second world war, when America has started to build industries and people of color still used to do menial jobs. Denzel and his wife make a decent lower middle class living and raise kids. Denzel is a black and white person, who has slogged it hard in a job of a trash disposal person from the corporation, and makes an honest living and lives within his means. He does not pay anything extra for luxuries to his younger son, when he wants to take basketball classes in school to pursue his passion. Denzel was also a good sportsman once upon a time but has severed all ties with the game, due to the discrimination towards black that hurt him in past. The cinema is more like a play with excellent dialog deliveries, mirth, anger, redemption, everything carefully and artistically presented. The climax was when Denzel confesses to Rose that he has had an illicit affair with another woman and that the woman is bearing his child, Rose is heartbroken. But the magnanimity that she shows to this helpless little child, when her mother dies while giving birth to her, just makes the character of this woman much larger than life. It makes her an epitome of acceptance and love which is above everything. The character of Denzel's brother adds color to the story line. Denzel's performance as a seasoned thespian deserves kudos. But Viola Davis has done an equally great job and also out-performed Denzel in many scenes.

Stars : 4.5 out of 5

---

### ***Shubh Mangal Savdhaan (Hindi)***

**Director : R.S.Prasanna**

**Cast : Ayushman Khurrana, Bhumi Pednekar, Brijendra Kala, Seema Pahwa**

This couple has proven their mettle in "Dum Laga ke Haisa" before. Ayushman and Bhumi do an excellent job of portraying a not much experimented topic hitherto in Indian movies. It is about the disfunction of a male anatomy (common known as ED), and the understandable jitters that it causes to a boy who is about to marry a girl that he is in love with. The girl is extremely accommodating even to the extent of forcing herself to go out of her normal genteel self and to seduce the boy and failing miserably there. She embodies a small town middle class girl that is trying all out to secure her marriage at any cost. She knows that she is not extremely good looking and that her family is also under a great deal of pressure to get her married off. She is even ready to reconcile to the fact that her husband may not ever have his "act" together. Amid the tumultuous





roller coaster journey of friendship, love, quarrels, let downs, making up, it is worth noting that they never give up on hope. It is this hope that eventually wins and after a lot of patience, they consummate their marriage. A beautiful love story with a unique twist. There are silent moments over a cup of tea and biscuit that just show the subtlety of the director. Never for once is there a vulgar moment. Supporting actors like seasoned stage actors Brijendra Kala and Seema Pahwa give a stellar performance. All in all, it is a delight to watch this movie.

Stars : 4 out of 5

---

### ***Shaadi Me Zaroor Aana (Hindi)***

**Director : Ratnaa Sinha**

**Cast : Rajkummar Rao, Kriti Kharbanda, Govind Namdev**

Rajkummar Rao is one of those new age actors that have made his entry into Hindi films with a solid foundation of stage acting. His other movies like City Lights, Bareilly ki Barfi and Trapped have really solidified his stature as a seasoned thespian who can single handedly pull through an entire movie, unfettered.

Set in the middle class milieu of Kanpur, this film ventures into the issues of dowry and a young lady's aspirations to realize her career ambitions at the cusp of the marriage preparations. The bride abandons her nuptial ceremony to pursue her ambitions. In a rarest twist of events, few years down the line, the abandoned groom to be turns out to be her boss who goes to any extreme to make her life miserable. The climax is something I won't divulge. You can surely watch it with your family. This is a crisp movie with nice dialogs. Rajkumar does an excellent job in transforming from an affable guy wearing his heart on his sleeves to a ruthless matter of fact bureaucrat, exacting his revenge.

Stars : 4 out of 5

---

### ***Macher Jhol (Bengali)***

**Director : Pratim D. Gupta**

**Cast : Ritwick Chakraborty, Paoli Dam, Mamata Shankar**

A very coming of age movie featuring a celebrity chef who comes back to Kolkata to attend to his ailing mother. Amid broken relationships with the protagonist and his wife and father, this film is about love. To attend to his mother's wish to repeat the same dish that he had cooked for her when he was a teenager, Dev goes to any extent to create the same magic. However, after repeated failures, he finds the true reason why his mother was discarding his dishes. The film has quite a few shots in Paris, where Dev is the head chef in a star rated restaurant. "Macher Jhol" portrays Paoli, the wife of Dev whom he estranged years ago to struggle for his dream. If anything, it glorifies the character of a wife who has sustained rejection due to no fault of hers, reared a son, with no information (read "burden") to the father. It elevates her to a level so strong and magnanimous, that she even provides advices to Dev after all these years when solicited.

Overall an excellent movie that has a taste of a true European movie, akin to De Sica or Fellini's gendres.

মুছে যাক গ্লানি  
দুচে যাক জরা



অগ্নিস্থানে শুচি হোক ধরা



